সোনার স্যুটকেস

ফণিভূষণ আচার্য

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তৃতীয় মুদ্রণ
ডিসেম্বর ১৯৬২

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশি
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মু

শ্রীমান কুশল চক্রবর্তী

ও

মাস্টার অরিন্দম

কল্যাণীয়েষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

উপন্যাস :	হলুদ পাখির ডাক
	পলাশ বনের গোধূলি
	পঞ্চকন্যা
	হা রে কলকাতা
	প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য
	জ্যোৎস্নায় বাঘবন্দী খেলা
	সরসী
	স্বীকার করছি
গল্পগ্রন্থ :	মহুয়ার নেশা
কিশোর উপন্যাস :	খাঁচার ভিতরে বাঘ
কাব্যগ্রন্থ :	ধূলি মুঠি সোনা
	আমরা ভাসানে যাচ্ছি
	ধর্মদা আর কতদূর
	মনীষা কোথায় আছো

১ ভয়ের ভেতর

ট্রেন থামলো।

স্টেশনে বাবার আসার কথা। আমি আর বুলি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাবাকে খুঁজছিলুম। প্লাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় এসে আমাদের কামরাটা থেমেছে। লোকের ভিড়ে বাবাকে কোথাও দেখতে পেলুম না। মনটা বড় দমে গেল।

বুলি ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললো—'দেখলে মা, আমার কথাই ঠিক হলো—বাবা আসেনি।'

মা ওকে সরিয়ে দিয়ে জানলার কাছে মুখ নিয়ে কুলি ডাকতে লাগলেন। কুলি কোথায়? এত ছোট্ট স্টেশন, এখানে কুলিও পাওয়া যায় না। শেষে একটা গাঁয়ের মানুষকে মা হাত নেড়ে ডাকলেন।

'আমাদের বেডিং সুটকেসটা নামিয়ে দেবে, বাবা? পয়সা দেবো।'

লোকটা হাবার মতো কি একটু ভাবলো। তারপর আমাদের কামরায় উঠে এসে প্রথমে বেডিং, তার ওপরে সুটকেস চাপিয়ে আনাড়ির মতো টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। তার পেছনে মা দুহাতে আমার আর বুলির হাত চেপে ধরে বেরিয়ে এলেন।

প্লাটফর্মে পা দিয়েই আমার মনে পড়লো, আমাদের সিটের নিচে একটা জিনিস থেকে গেছে, নামানো হয়নি। মা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন ওটার কথা। আমি মার হাত থেকে ঠিক একটা আমের আঁটির মতো ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়ে আমাদের কামরায় লাফিয়ে উঠে পড়লুম।

তখনই ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল। এবার ট্রেন ছেড়ে যাবে।

ভয় পেয়ে মা আর বুলি চিৎকার করে আমাকে ডাকছে। আমি

সিটের তলায় ঢুকে একটা কোণে ওটা আবিষ্কার করলুম। একটা কুঁজোর স্ট্যাণ্ড। কুঁজো নেই, রাস্তায় ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ভেঙে গেছে। এখন সেই স্ট্যাণ্ডটা তো আমাদেরই সম্পত্তি। ওটা ফেলে যাবার কোন মানে হয়?

ওটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, মনে হলো, ট্রেন ছাড়লো। আমি হুড়মুড় করে দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে ইঞ্জিনের দিকে মুখ করে নেমে পড়লুম। ভয়ে মা আর বুলির মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। ওরা মিছি-মিছি ভয় পেয়েছিল। আমি কি আর অত ছোট আছি যে, ট্রেন থেকে নামতে পারবো না? বা, নামতে গিয়ে পড়ে যাবো?

মা রাগ করে বললেন—'কি এমন আহা-মরি জিনিস! ওটার জন্যে জীবন দিতে গিয়েছিলি?'

আমি বুঝতে পারছিলুম, মার রাগটা আমার চেয়ে মেজোমামার ওপরেই ছিল বেশি। মেজোমামাকে আমাদের জন্যে একটা ওয়াটার বট্‌ল্ কিনে আনার কথা বলা হয়েছিল। মেজোমামা ওয়াটার বট্‌ল্ না কিনে স্ট্যাণ্ডসুদ্ধ একটা জলের কুঁজো কিনে নিয়ে স্টেশনে এসে হাজির। বললেন—'এতে অনেক জল ধরবে, খেয়ে ফুরোতে পারবি না।' উৎসাহের সঙ্গে তিনি স্টেশনের কল থেকে জলও ভরে দিয়ে গেলেন। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, মেঝের ওপর জলের তোড়ে সামনের সিটের একটা লোকের চটি ভেসে যাচ্ছে। আমরা জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলুম। অত বুঝতে পারিনি। লোকটার চেঁচামেচিতে বুঝতে পারলুম, মেজোমামার কুঁজো ফট্, অর্থাৎ ফেটে গেছে।

কুঁজো গেছে—যাক্, তাই বলে স্ট্যাণ্ডটা ফেলে যাওয়া কি ঠিক হতো?

রাগে মা থরথর করে কাঁপছিলেন। ঠিক তখনই ভিড়ের ভেতর বাবার মুখটা দেখতে পেয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—'ওই তো বাবা এসে গেছে—' মার রাগও অমনি পড়ে গেল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

বাবা এসে বুলির হাত ধরলেন। মা বললেন—'এত দেরি করলে যে?'

বাবা হেসে বললেন—'রাস্তাটা তো ভালো নয়। জিপ আসতে একটু দেরি করে ফেললো।'

একটা মোটা গোঁফওলা লোক আমাদের বেডিং ও সুটকেস ঘাড়ে তুলে নিল। বাবা আমার হাতে কুঁজোর স্ট্যাণ্ডটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন—'এটা আবার কি?'

বুলি হেসে বাবাকে কি-একটা বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই বাবা ওই মোটা গোঁফওলা লোকটাকে বললেন—'রামদেও, ওটা ওর হাত থেকে নিয়ে জিপে রাখো গিয়ে—'

মা তাঁর ব্যাগ খুলে গাঁয়ের মানুষটাকে একটা টাকা দিলেন। লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। এইটুকু কাজের জন্যে তাকে কেউ কোনদিন বোধহয় একটাকা দেয়নি।

স্টেশনের বাইরে একটা জগদ্দল-মার্কা জিপ দাঁড়িয়েছিল। আমাদের বেডিং, সুটকেস—সব এনে রামদেও জিপের পেছনের সিটে তুলে রেখেছে। মা আর বুলি পেছনের সিটে বসলো। রামদেও ড্রাইভার। আমি আর বাবা তার পাশে উঠে বসলাম। বসতে বসতে বাবা বললেন—'ট্রেনটা ডেইলি লেট করে। আজ দেখছি, রাইট টাইমে এসে গেছে। যাক্, আমারও খুব-একটা দেরি হয়নি।'

প্রচুর ধুলো উড়িয়ে বিকট আওয়াজ করতে করতে আমাদের জগদ্দল ছুটে চললো।

রাস্তাটা যে এত খারাপ হবে, আমরা জানতুম না। যেমন উঁচু-নিচু, তেমনি এবড়ো-খেবড়ো। এক-এক সময় জিপের এক-এক রকম আওয়াজ বেরোচ্ছে। এক-একবার মনে হচ্ছে, জিপটা বোধ হয় ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে যাবে।

ভয়ে বুলি মাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। আমি কিছু না পেয়ে দু'হাতে সিটটাকে খামচে ধরে আছি। বাবা তা দেখে আমাকে কাছে টেনে নিলেন। বললেন—'কি রে, ভয় করছে?'

অনেক সময় ভয় করলেও মুখে কিছু বলা যায় না। বললুম—'না। ভয় করছে না।'

একটু থেমে বাবা জিজ্ঞেস করলেন—'ট্রেনে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

বললুম—'না। শুধু ওই কুঁজোটা—'

'কুঁজোটা, মানে?'

'মেজোমামা ওয়াটার বট্‌ল্ না কিনে কাঠের ওই স্ট্যাণ্ডে একটা বিরাট কুঁজো দিয়ে গেলেন। সিটের নিচেই ওটা ছিল। আমরা বাইরের গাছপালা দেখছিলুম। বুঝতে পারিনি, কখন ওটা ভেঙে গিয়ে একটা লোকের চটি একেবারে—লোকটার সে কী রাগ!'

গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ভীষণ উঁচুনিচু রাস্তা। মাঝে মাঝে বিরাট গর্ত। পুকুর, বাঁশবন, আমকাঁঠালের বাগান, রাঙচিতের বেড়া, আর কলার ঝাড়গুলোকে কাঁপিয়ে আমাদের জিপ ছুটে চললো। আমাদের জিপের বিকট আওয়াজ শুনে রাস্তার লোকেরা প্রাণের ভয়ে রাস্তা থেকে নেমে পালাচ্ছে। বৌ-ঝিরা আর বাচ্চাগুলো মুখে আঙুল দিয়ে এই অদ্ভুত জিনিসটাকে দেখছে অবাক হয়ে। পেছনে প্রকাণ্ড একটা ধুলোর ল্যাজ নিয়ে আমাদের জিপ গ্রাম ছেড়ে মাঠের মধ্যে এসে পড়লো। ঘাস-মুড়োনো ধু ধু মাঠ। গোরু চরছিল। আমাদের জিপের ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনে গোরুগুলো আঁতকে উঠে ল্যাজ তুলে হাঁকডাক ছাড়তে ছাড়তে নিরাপদ দূরত্বে ছুটে পালাতে লাগলো।

আমি হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছি। হাসবো কি? পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো সব এক-একটা ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন। তার ওপর বাবা পাশে বসা। হাসি চাপতে হচ্ছে। সে যে কী কষ্ট!

তারি মধ্যে মা চেঁচিয়ে উঠলেন—'এই থামাও, থামাও। বেডিংটা পড়ে গেছে—'

রামদেও জিপ থামালো। একটা অবাধ্য জানোয়ারের মতো ওটা লাফাতে লাফাতে অনেক দূরে এসে থামলো। রামদেও নেমে গিয়ে বেডিংটা ঘাড়ে করে ফিরে এলো। মা তারপর ভয়ে বেডিংটা

ধরেই বসে রইলেন। যদি আবার পড়ে যায়!

রামদেও তার সীটে উঠে এসে স্টার্ট দিল। একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে জিপটা একটু নড়েচড়ে আবার থেমে গেল। রামদেও অনেক চেষ্টা করে শেষে নেমে গিয়ে এখানে-ওখানে বার কয়েক হাতুড়ি দিয়ে ঠোকাঠুকি করলো। তারপর স্টার্ট দিতেই গাড়িটা রাগী ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠে ছুটতে সুরু করলো।

দু'পাশে বিশাল মাঠ। মাঠের ওপরে প্রকাণ্ড একখানা আকাশ অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে গড়াতে চলে গেছে। শেষটা আর দেখা যায় না। এত বড় আকাশ আমি কলকাতায় কখনো দেখিনি। বাবা বললেন—'আর বেশি নয়। মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিট।'

আরো বিশ-পঁচিশ মিনিট! তাও বাবার কাছে হলো মাত্র? জিপের ঝাঁকুনিতে আমার তো পিঠ-পেট সব ব্যথা হয়ে গেছে।

একটা নবাখালের কাছে জিপটা থেমে পড়লো। বাবা বললেন—'এখানে একটু নামতে হবে।'

নামতে পেয়ে আমার খুব আনন্দ হলো। বাবা মা বুলি—সবাই নামলো। সবাইকে নামিয়ে দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে জিপটা খালের ভেতর নেমে গেল। ওপরে ব্রিজটা ভেঙে গিয়েছিল। তাই নেমে খাল পেরোতে হবে। খালে অবশ্যি জল ছিল না। কিন্তু জিপটা সেই-যে নামলো, আর উঠতেই চায় না। অনেক কষ্টে ঘেমে-নেয়ে রামদেও জিপটাকে ওপারে নিয়ে তুললো। আমরা যে-যার জায়গায় উঠে বসলুম। জিপ গজরাতে গজরাতে আবার ছুটে চললো।

এপারের দৃশ্যগুলো আরো সুন্দর। সবুজ গাছগাছালিতে ভরা গ্রাম। পুকুরের ধারে সজনের গাছ। ওর ডালে একটা বক বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। জিপের শব্দে সে ঘুম ভেঙে উড়ে পালালো। একটা দড়িতে-বাঁধা ছাগল আমাদের জিপটাকে দেখে ভয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে চ্যাঁচাচ্ছে।

তারপর আবার মাঠ সুরু হয়েছে।

আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। এত বড় মাঠ,

এত বড় আকাশ, এত গাছপালা—এক সঙ্গে এত কিছু আমি এই প্রথম দেখছি।

কিছুক্ষণ পরে বাবা পেছন ফিরে মাকে বললেন—'ওদিকের ওই মন্দিরটা দেখ, প্রায় একশো বছরের পুরনো—বিষ্ণুর মন্দির।'

আমিও ঘাড় ঘুরিয়ে মন্দিরটা দেখলুম। বেশ পুরনো মন্দির। সামনে পাঁচিল-ঘেরা অনেকখানি খোলামেলা মাঠ। এ রকম মাঠ দেখলে আমার ফুটবল খেলতে ইচ্ছে করে। স্কুলের কিংবা পাড়ার বন্ধুদের যদি এখানে পেতুম, তাহলে বেশ একটা ম্যাচ্ খেলা যেতে পারতো।

এখান থেকে দেখা যায়, মাঠের মধ্যে দ্বীপের মতো খানিকটা জায়গা জুড়ে বেশ বড়ো বড়ো গাছের জটলা। মাঝখানে জলের মতো কি যেন চিকিচিক করছে। আকাশে আলো নিবে আসছিল। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'ওটা কি বাবা?'

বাবা বললেন—'ওটা কিছু নয়। একটা জলা জায়গা। পাশে শ্মশান।'

শ্মশানের নাম শুনে ভয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। আমি সামনের দিকে তাকাতে লাগলুম। সামনেই রাস্তাটা হিলহিল করে এঁকেবেঁকে একেবারে গাঁয়ের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। আমি মনে মনে ঠাউরে নিলুম, এটাই সাহেবকুঠি। ওখানেই আমরা যাচ্ছি।

বাবার কাছেই শুনেছিলুম, ইংরেজ আমলে এখানে জিম সাহেব নামে এক সাহেবের কুঠি ছিল। ইংরেজরা তখন এদেশ থেকে নীল পাট সংগ্রহ করে বিলেতে চালান দিত। সাহেবদের তখন ছিল খুব দাপট। বিষ্ণুর নামে এ গাঁয়ের নাম আগে ছিল বিষ্ণুচক। গাঁয়ের জমিদার কুণ্ডুরাই মন্দিরটা বানিয়েছিলেন। মন্দিরে অনেক সোনাদানা। কুণ্ডুদের সঙ্গে সাহেবদের তখন খুব দহরম মহরম। লোকে ধীরে ধীরে বিষ্ণুচক নাম ভুলে যেতে লাগলো। সাহেবকুঠির নামে গাঁয়েরও নাম হয়ে গেল সাহেবকুঠি।

শেষে একদিন দেশ স্বাধীন হলো। সাহেবরা কুণ্ডুদের কাছে সাহেবকুঠি বিক্রি করে দিয়ে চলে গেল। কুণ্ডুরাও বেশীদিন সাহেবকুঠি হাতে রাখতে পারলো না। তাদের জমিদারি চলে গেল। তবু শেষ পর্যন্ত ওরা সাহেবকুঠি হাতে রেখেছিল। কিন্তু দিনে দিনে ওদের অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগলো। শেষে একদিন সাহেবকুঠি বিক্রির বিজ্ঞাপন বেরুলো কাগজে।

বাবা সেই সময় চাকরি ছেড়ে কিছু একটা করার কথা ভাবছিলেন। বাবা ছিলেন কলকাতার সিটি কলেজের বোটানির প্রফেসার। কলেজে কি একটা গণ্ডগোল হলো। বাবা রাগ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলেন। একবার ভাবলেন, ব্যবসা করবেন। আর একবার ভেবেছিলেন, ওষুধের দোকান করবেন। শেষে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কাউকে কিছু না বলে তিনি সাহেবকুঠি দেখে এলেন। তারপরই আমাদের আরপুলি লেনের চারতলা বড় বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। সেই থেকে আমরা উঠে এসে মামাদের পাড়ায় একটা ভাড়াটে বাড়িতে থাকি।

বাবা সাহেবকুঠিতে এসে নতুন জীবন শুরু করলেন। একটা জিপ, একটা হাল্‌কা কলের লাঙ্গল কিনেছেন তিনি। একটা শ্যালো টিউবওয়েলও বসিয়েছেন। রোজ প্রায় বিশ-পঁচিশ জন লোক খাটছে। প্রতি মাসেই একটা নয়-একটা ফসল উঠছে। তাছাড়া, ফিশারির নানা রকমের মাছ, আর পোলট্রির নানা জাতের মুরগী তো আছেই।

আমরা কলকাতার ফ্ল্যাটে বসে বাবার চাষের ব্যবসার গল্প শুনি। একবার দেখে আসতে খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু বাবা না নিয়ে গেলে যাই কি করে?

কদিন আগে বাবা ঘণ্টা কয়েকের জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন। আমি আর বুলি খুব করে বায়না ধরলুম, সাহেবকুঠি দেখতে যাবো। বাবা বলে এসেছিলেন, সামনের গরমের ছুটিতে আমাদের সাহেব-কুঠিতে নিয়ে আসবেন।

আমি আর বুলি কলকাতার পাঠভবন স্কুলে পড়ি। আমি ক্লাস

নাইনে, বুলি সেভেনে। গরমের ছুটিতে আমার বন্ধুদের কেউ যাচ্ছে দার্জিলিং, কেউ সিমলা, কেউ-বা শিলং পাহাড়ে। আমি আর বুলি যাচ্ছি কলকাতা থেকে চুয়াত্তর মাইল দূরে সাহেবকুঠিতে, যার নাম কেউ কখনো শোনেনি। সবাই আমাদের কথা শুনে হাসলো। হাসুক। পৃথিবীর নামী জায়গাগুলোই কি শুধু দেখবার? অনামী জায়গাগুলোয় কত কী দেখার আছে, কত-কী ঘটছে, কে তার খবর রাখে? সেবার সাহেবকুঠি না গেলে অনেক কিছুই আমার জানা হতো না। আমি হলপ করে বলতে পারি, আমার বন্ধুরা, যারা দার্জিলিং, সিমলা বা শিলং পাহাড়ে গিয়েছিল, তারা কেউ আমার মতো এমন ভয়ংকর ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়েনি। ফিরে গিয়ে ওদের এসব ঘটনার কথা যখন বলবো, তখন ওরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। কিন্তু সাহেবকুঠির প্রতিটি মানুষ, যারা সব দেখেছে, তারা তো মিথ্যে কথা বলবে না। থানার রিপোর্টেও তার রেকর্ড আছে।

উঁচুনিচু রাস্তায় টাল খেতে খেতে জিপটা এবার গাঁয়ের ভেতর ঢুকলো। কিছুদূর যেতেই লম্বা-টানা একটা পাকাবাড়ি দেখে আমি বললুম—'এটা এখানকার স্কুল, না বাবা?'

'ঠিক ধরেছিস। আর ওপাশে ওই-যে গাছপালাগুলোর ভেতরে একটা বড় ভাঙা দোতলা কোঠাবাড়ি দেখছিস, ওটা হচ্ছে এখানকার জমিদারবাড়ি। এখন ওখানে কেউ থাকে না।'

তারপর অনেকগুলো মাটকোঠার বাড়ি, পুকুর, ঝোপঝাড় আর কুঁড়েঘর ছাড়িয়ে আমরা আবার মাঠের মধ্যে এসে পড়লুম। মাঠের মধ্যেই কয়েকটা একতলা কোঠাবাড়ি। তার চারধারে গাঢ় সবুজের ভিড়। চারদিকে পাঁচিল, পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ওটাই সাহেবকুঠির কুঠিবাড়ি। সামনে জিপ এসে পড়তেই লোহার জংধরা গেটটা খুলে গেল। আমাদের নিয়ে জিপ কুঠিবাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে অবন্তীবাবু, বনমালী, মংলু, সন্তা—যে যেখানে ছিল, ছুটে বেরিয়ে এলো। আমরা জিপ থেকে নেমে আসতেই সবাই

আমাদের ঘিরে ধরলো। মংলু আর বনমালী আমাদের জিনিসপত্র নামাচ্ছে। বনমালীর হাতে কুঁজোর স্ট্যাণ্ডটা দেখে সন্তা ওটাকে ছোঁ মেরে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

আমি বললুম—'ওটা কিন্তু কুঁজোর স্ট্যাণ্ড—'

সন্তা বললো—'এটা দিয়ে একটা চমৎকার খাঁচা হবে। আমি এই রকম একটা জিনিসই খুঁজছিলুম। এতে আমি কাক পুষবো।'

'কাক?'

আমি অবাক হয়ে গেলুম। কাক আবার কেউ পোষে নাকি?

'কেন? কাক বুঝি পাখি নয়?'

সে কুঁজোর স্ট্যাণ্ডটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

'আমি একটা সাপ পুষেছি। দেখবে?'

আমি সন্তার সঙ্গে গেলুম। সে তার ঘরের ভেতর থেকে একটা মাটির হাঁড়ি বের করে আনলো। সরা দিয়ে ওটার মুখ চাপা। সরাটা সরিয়ে দিতেই একটা সাপ ফণা তুলে উঠে দাঁড়ালো। আমি ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলুম। সাপটা দুলছিল আর ওর দুটো লিকলিকে কালো জিব বের করে দেখাচ্ছিল। সন্তা আমাকে কাছে ডাকলো—'আয় না, গায়ে হাত দে। খুব ভালো ছেলে। কাউকে কিছু বলে না। এই ছাখ্—'

বলে সে সাপটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলো।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—'ওটা তোর কি সাপ?'

'কালনাগিনী—'

হাঁড়িটার মুখে সরা চাপা দিয়ে সে ওটা ঘরের ভেতরে রেখে এলো। সত্যি বলতে কি, ভয়ের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। আমি সন্তার প্রতি সেই প্রথম থেকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লুম।

চারদিকে কেমন একটা সবুজ-সবুজ গন্ধ। ফাঁকা মাঠের ভেতর হুহু করে হাওয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আকাশের আলো নিবে এলো। মাঠের শেষ সীমানায় অন্ধকার সুড়সুড় করে নামছে।

মংলু এসে আমাকে ডাকলো—'দা'বাবু, খাবি চলো—' মংলু

'কালনাগিনী –'

জাতে সাঁওতাল। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। আমার কিন্তু সন্তাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

বাথরুমে মুখহাত ধুয়ে গরম হালুয়া আর লুচি খেয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, বাইরে হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছে। চারদিক আলোয় আলো হয়ে গেছে। সেই আলোয় বাবা, অবন্তীবাবু, বিডিও অফিসের কেষ্টোবাবু আর স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড্‌মাস্টার তারিণীবাবু তাস খেলতে বসে গেছেন।

সন্তা উঠোন থেকে আমাকে ইশারায় ডাকলো। আমি উঠোনে নেমে গেলুম। সন্তা আমার কাঁধে হাত রাখলো। আমাকে নিয়ে সে গেটের বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে অন্ধকার। অন্ধকারে নিজের হাতদুটোও দেখতে পাচ্ছি না।

সন্তা বললো—'চল, একটু বেড়িয়ে আসি—'

বললুম—'এই অন্ধকারে?'

'ভয় কি? আমি তো আছি।'

দুজনে অন্ধকারে উঁচুনিচু রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলুম। মনে হলো, সন্তা যেন আমার অনেকদিনের বন্ধু। আজই যে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, তা নয়। অনেক—অনেকদিনের পরিচয়। হঠাৎ একটা কিসের শব্দে আমরা চমকে অন্ধকারে পেছন ফিরে তাকালুম। কিছুই দেখতে পেলুম না। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। আমি ভয়ে সন্তার হাতটা খামচে ধরলুম। জিজ্ঞেস করলুম—'কে?'

'শ্‌ শ্‌ শ্‌—'

সন্তা হিড়হিড় করে আমাকে টানতে টানতে রাস্তা থেকে নিচে নামতে লাগলো। হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে যেতেই সেও আমার পাশে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে আমরা দেখলুম, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে কে চলে গেল। শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতেই সন্তা আমাকে টেনে তুললো। ভয়ে আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল। কিন্তু আমি আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলুম না। জিজ্ঞেস করলুম—'কে?'

সন্তা আমার হাত ধরে রাস্তার ওপরে উঠে আসতে আসতে

বললো—'কে, কেউ জানে না। মাঝে মাঝে সাহেবকুঠির রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। কেন যায়, কোথায় যায়—কেউ বলতে পারে না। যে সামনে পড়ে, সে নাকি আর বাঁচে না। বাঁচলেও নাকি অন্ধ হয়ে যায়। কেউ বলে, বিষ্ণুচকের বিষ্ণুঠাকুর রাতে মন্দিরে আসে। আবার কেউ বলে, সাহেবকুঠির জিম সাহেবের ভূত রাতের অন্ধকারে ওর কুঠি দেখতে আসে। কিন্তু আমার মনে হয় —অন্য কিছু।'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'কি মনে হয় তোমার?'

সন্তা ঘোড়াটার মিলিয়ে-যাওয়া শব্দের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। বললো—'তোর নাম কি রে?'

'বিল্লু।'

'আমার নাম সন্তা। তুই গোয়েন্দা গল্প পড়িস?'

'পড়ি।'

'এই ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া—ব্যাপারটা কি হতে পারে, কিছু ঠাহর করতে পারিস?'

আমি অন্ধকারের ভেতর এদিক-ওদিক তাকালুম। বললুম—'কিছুই তো বুঝতে পারছি না—'

'তোরা ক'দিন থাকবি এখানে?'

বললুম—'মাসখানেক—'

'কিছুদিন থাকলেই বুঝতে পারবি—'

সন্তা আমার মনে আরো ভয় ধরিয়ে দিল। আমার আর ঐ ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, যে-কোন সময়ে কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আমাদের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়বে। আর, আমরা অন্ধ হয়ে যাবো, নয়তো মরে যাবো।

সন্তা কি ভেবে বললো—'চল্, আজ ফেরা যাক্।'

২ কিসের শব্দ ?

এখানে কুঠিবাড়িতে অনেকগুলো ঘর। ঘরগুলো ছড়ানো—বড়ো খাপছাড়া। এমনি একটা ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা হলো। ঘরটা বেশ বড়োসড়ো—আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটের প্রায় চারখানা ঘরের সমান।

এতবড় ঘরে আমি একা থাকবো, ভাবতেই আমার হাত-পা হিম হয়ে আসছিল। আমি ভয়ে ভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। বাবা তা বুঝতে পেরে বললেন—ভয় কি? দরজার কাছে মংলু শোবে। রাজা বারান্দায় থাকবে। ও তো সারারাত জেগেই থাকে।

রাজা বাবার অ্যাল্‌সেশিয়ান।

আমি যে খুব সাহসী, তার প্রমাণ দেবার জন্যে আমি ঘরটায় একা থাকতে রাজী হয়ে গেলুম।

এত বড় ঘরে আমি একা—সস্তাটাও যদি থাকতো, তবু একটু সাহস হতো। ভয়ে ঘুম আসছিল না।

ক'দিন পরের ঘটনা।

মাঝরাত্তিরে কি একটা শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বুঝতে পারলুম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আবার সেই শব্দটা হলো। কে যেন কোথায় লোহা পেটাচ্ছে। এক-একবার মনে হচ্ছে, শব্দটা এই সাহেবকুঠির ধারে-কাছেই কোথাও হচ্ছে। আবার এক-একবার মনে হচ্ছে, না—বেশ দূরে। তখন মনে হয়, কেউ যেন দূরে কোথাও ভারী কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলাই করছে। কিংবা অন্য কিছু।

কিন্তু এত রাত্তিরে কেই-বা কাঠ চেলাই করবে? কেনই-বা করবে? এমন কি জরুরী দরকার? গরমের সময় এখন। রাত বোধ হয় দুটোর কম নয়। এখন সবার ঘুমোবার সময়। এখন কে

রাত জেগে কাঠ চেলাই করবে ?

কয়েকদিন আগেও মাঝরাত্তিরে এমনি শব্দ হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে হয়েছিল। ঘরে একা শুয়ে বড়ো ভয় করছিল আমার। নিশুতি রাতে চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে শব্দটা কেমন একটা ভয় পাইয়ে দেয়। ভয়ে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে শুয়েছিলুম। এদিকে এখনো ইলেক্‌ট্রিক আসেনি ; কবে আসবে, ঠিক নেই। কাজেই, ঘরে আলো কিংবা পাখার কোন ব্যবস্থাই নেই। গরমের মধ্যে ভয়ে আমি ঘামছিলুম। দরজার বাইরে মংলুর নাক ডাকছে। রাজা ঘুমের মধ্যে জিব দিয়ে মাঝে মাঝে চুক্‌চুক্ আওয়াজ করছে।

আমি কিন্তু ঘুমোতে পারছিলুম না। কারণ, ওই বিচ্ছিরি শব্দটা। পরের দিন সকালে আমি মংলুকে শব্দটার কথা বলেছিলুম। মংলু বিশ্বাস করেনি। গরমে সারারাত সে নাকি একটুও ঘুমোতে পারেনি। ইস্, মংলুটা এত মিথ্যে বলতে পারে !

সকালে জলখাবার খেতে বসে বুলিকে জিজ্ঞেস করছিলুম শব্দটার কথা।

'কাল মাঝরাত্তিরে একটা শব্দ হচ্ছিল কোথায়। শুনেছিস ?'

বুলি যেন আকাশ থেকে পড়লো !

'শব্দ ? কিসের শব্দ ?'

'কেমন লোহা-পেটানের মতো। শুনিস্‌নি তুই ?'

'কোথায় ?'

'অনেক দূরে—'

'না।'

এ পর্যন্ত ভালোই ছিল। কিন্তু বুলিটা মহা পাকা। সে চেঁচিয়ে মাকে বলে উঠলো—'মা, শোনো, শোনো। বিল্লুটা কী ভীতু ! কাল রাত্তিরে নাকি কোথায় ও অনেক দূরে লোহা-পেটানোর শব্দ শুনেছে—'

বাবা লুচিতে আদ্ধেক কামড় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'এ্যাঁ ? কি—'

মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বুলি হাসতে হাসতে বলে

ফেললো—'কাল রাত্তিরে বিল্লু নাকি কি একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে—'

বুলি আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। তাই ও আমার নাম ধরে ডাকে। আমি ওকে অনেক ভয় দেখিয়েও 'দাদা' বলে ডাকাতে পারিনি। যাক্ সে কথা।

বাবা লুচি চিবোতে ভুলে গিয়ে আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন। জিজ্ঞেস করলেন—'শুনেছিস?'

আমি বললুম—'হ্যাঁ। অনেক রাত্তিরে—'

'শব্দটা কি রকম বলতো?'

'অনেকটা ঠিক লোহা-পেটানোর মতো—'

'কাছে কোথাও?'

'না, দূরে। মাঝে মাঝে মনে হয়, কাছে—'

বাবা গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুখের খাবার চিবোতে চিবোতে বললেন—'হুঁ, আমিও শুনেছি।'

আমি বুলির দিকে খুব তেরচা চোখে তাকালুম। ওর মুখটা তখন শুকিয়ে গেছে। আমি জানি, সেও নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিল।

বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'ঘরে একা শুতে ভয় করে তোর?'

আমি কোন কথা বললুম না।

'ভয় কি? দরজার বাইরে তো মংলু আর রাজা শোয়—'

আমি নীরব।

বাবা একটু কি ভেবে নিয়ে বললেন—'ঠিক আছে। অবন্তীবাবুর ছেলে আজ থেকে তোর ঘরে শোবে। খুব সাহসী ছেলে। তাহলেও ভয় পাবি নাকি?'

অবন্তীবাবু বাবার খামারের ম্যানেজার। ওঁর ছেলে সন্তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সে রাত্তিরে যদি আমার ঘরে শোয়, আমি হয়তো আর ভয় পাবো না।

সেদিন রাতে সন্তা তার বিছানা-বালিশ নিয়ে হাজির হতেই ওকে জিজ্ঞেস করলুম—'এখানে কি ধারেকাছে কোথাও কামারশালা

আছে, তুই জানিস ?'

অনেক ভেবেচিন্তে সে বললো—'আছে। কিন্তু সে তো অনেক দূরে। এখান থেকে পাঁচ-ছ মাইল হবে। কেন বলতো ?

আমি ওকে সেই শব্দটার কথা সমস্ত খুলে বললুম। সেও প্রথমে বুলির মতো বিশ্বাস করতে চায়নি। বললো—'আর কেউ শুনেছে ? মংলু তো বাইরে শুয়ে থাকে। সে শুনেছে ?'

কিন্তু আমি যখন বললুম, বাবা শুনেছেন, তখন সে ভুরু কুঁচকে বললো—'ঠিক আছে। আজ রাত্তিরে আমাকে শোনাতে পারবি ?'

আমি জোর দিয়ে বললুম—'নিশ্চয়ই !'

সেদিন সারারাত আমি আর সন্তা দুজনে জেগে বসেছিলুম শব্দটা শুনবো বলে। কিন্তু ঝিঁঝির ডাক, শেয়ালের পায়ের খস্‌খস্ আওয়াজ, রাজার গজরানি, মংলুর নাক-ডাকার শব্দ আর ঘোড়ানিমের গাছে প্যাঁচার পাখা-ঝাপটানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পাইনি। সন্তা তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে ডাহা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিলে, আমি কিন্তু হাল ছেড়ে দিতে পারলুম না। আমি নিজের কানে শুনেছি যে! আমি জানতুম, একদিন আমি সন্তাকে শব্দটা ঠিক শোনাতে পারবো। নিশুতি রাতে অমন শব্দ শুনলে যে কেউ ভয় পাবে—সন্তাও পাবে।

কয়েকদিন পরেই—আবার ! মাঝরাত্তিরে ঠাঁই ঠাঁই করে লোহা-পেটানোর শব্দ। আমার শিরদাঁড়ার ভেতরটা শিরশির করে উঠলো। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে শব্দটা একা-একা শুনলুম। ভাবলুম, এবার সন্তাকে ডাকি। ডাকতে গিয়ে বুঝতে পারছি, গলাটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। একটা ঢোঁক গিলে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে ডাকলুম—'সন্তা, এই সন্তা—'

সন্তা ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন আমি কি করি ? কি করে ওর ঘুম ভাঙাই ? জোরে ডাকতেও ভরসা পাচ্ছি না। আবার, জোরে ডাকলে যদি শব্দটা থেমে যায় ? এমন একটা সুযোগ—

আমি খুব চুপি চুপি বিছানার ওপর উঠে বসলুম। শব্দটা এখনও সমানে শোনা যাচ্ছে—ঠাঁই ঠক্, ঠক্ ঠাঁই—। কখন ঘামতে শুরু

করেছি, জানি না। একটা ঘামের ফোঁটা তরতর করে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। আবার ফিস ফিস করে ডাকলুম—'সন্তা, এই সন্তা—'

নাহ্, সন্তার কোন সাড়া নেই। সন্তা ঘরে আছে কি নেই, তাও বোঝা যাচ্ছে না। এমনিতে আমি খুব সাহসী নই। কিন্তু মাঝেমধ্যে বিপদ-আপদের সময় আমি এমন কাজ করে বসতে পারি, যা দেখে জগৎশুদ্ধু লোক অবাক হয়ে যেতে পারে। সন্তার সাড়া না পেয়ে আমি তাই করে বসলুম। মশারিটা একটু-একটু করে তুলে আমার পা দুটো আস্তে আস্তে মাটিতে নামাতে লাগলুম। পায়ের তলায় মাটি লাগতেই গা-টা শিউরে উঠলো একটু। তখনো শব্দ হচ্ছে ঠাঁই ঠক্, ঠক্ ঠাঁই—

আমি কাপড় নিঙড়োবার মতো আমার সমস্ত শরীরে একটা পাক দিয়ে মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলুম। তারপব অন্ধকার হাত্ড়াতে হাত্ড়াতে সন্তার খাটের দিকে এগোতে লাগলুম। ওদিকের জানলায় হাত ঠেকলে বুঝতে পাবলুম, আমি সন্তার বিছানা হারিয়ে ফেলেছি। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। নিজেব বিছানাটাও যে কোনদিকে, তাও গুলিযে ফেলেছি। অন্ধকারে বুড়ি ছোঁয়ার মতো এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শেষে সন্তার বিছানাটা খুঁজে পেলুম। মশারি তুলে হাত বুলিয়ে দেখলুম, বিছানাতে সন্তা নেই। একটু পরে ভুলটা বুঝতে পারলুম। আমি ভুল করে নিজের বিছানাতেই ফিরে এসেছি। এমনিই হয়। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমরা কত কী-যে উদ্ভট সব ভুল করে বসি!

এবার আমি আমার বিছানার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সন্তার বিছানার দিকটা ভালো করে ঠাহর করে নিলুম।

শব্দটা এখনও হচ্ছে। ইস্, যদি থেমে যায়—

একটু ডানদিক চেপে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলুম। ইউরেকা! পেয়েছি! এবার আর ভুল হয়নি। সন্তার হারিয়ে-যাওয়া বিছানাটা আমি এবার খুঁজে পেয়েছি। মশারি তুলে দুহাতের দশ আঙুলে সন্তার পিঠটা খাব্লে ধরে ওর কানের ওপর ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি

ডাকলুম—'সন্তা—'

সন্তা চমকে রবারের মতো লাফ মেরে উঠে বসলো।

'কি?'

'ঐ—'

'কি?'

'শব্দটা—'

সন্তা কান পেতে অনেকক্ষণ শুনলো। তারপর বিছানা থেকে নেমে বললো—'চল্'—

আমি দুহাতে ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরে আছি। বললুম—'কোথায়?'

সে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললো—'চল্, মংলুকে ডাকি।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আস্তে আস্তে দরজার খিল-ছিট্‌কিনি খুলে আমরা বাইরে আসতেই রাজা গরগর করে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। সে আমাদের একটু শুঁকে নিয়ে বার-দুই পাক খেয়ে আবার মাটিতে শুয়ে পড়লো।

মংলুর নাক সমানে ডেকে চলেছে। সন্তা ওকে একটা ঠেলা দিতেই সে তড়বড় করে উঠে বসলো—'কে?'

মংলুর নাক-ডাকার শব্দটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহা-পেটানোর শব্দটাও কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

'ধুশ্—'

সন্তা খুব হতাশ হয়ে মংলুর বিছানার পাশে বসে পড়লো। আমিও ওর পাশে বসলুম। মংলু হাই তুলে জিজ্ঞেস করলো—'কি দা'বাবু, কাউকে দেখতি পেয়েছো?'

আমরা সবাই অন্ধকারে শব্দটার দিকে ওত পেতে বসে রইলুম। মাথার ওপর দিয়ে গোটা-দুই বাদুড় ডানায় হাওয়া কেটে দক্ষিণ দিকের জামরুল গাছের দিকে উড়ে গেল। সাঁই-সাঁই শব্দ হলো।

এমন সময় মংলুর নাকটা ঘড়ঘড় শব্দ করে উঠলো। বসে-থাকা অবস্থায় কোন লোকের নাক ডাকার ঘটনা সে-ই আমি একবার

দেখেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে সন্তা তাকে একটা ঠেলা দিলো।

আবার সেই শব্দটা শোনা যাচ্ছে। বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে শব্দটা যেন কালো কালো রিংএর মতো কোথা থেকে ভেসে আসছে –ঠাঁই ঠক্, ঠক্ ঠাঁই –

মংলু ভালো করে শব্দটা শুনে বললো – 'কেউ বোধয় কুথাও খোয়া ভাঙছে।'

সন্তা বললো – 'এত রাত্তিরে?'

মংলু কি একটু ভাবলো। বললো – 'বাবুসায়েবকে ডাকবো?'

সবাই মিলে বাবাকে ডাকলুম। টর্চহাতে বাবা বাইরে এসে এদিক-ওদিক অনেক ঘোরাঘুরি করলেন। শব্দটা আর হলো না। সে রাত্তিরে আর কারো চোখে ঘুম এলো না।

সকাল হতেই খবরটা আরো জানাজানি হয়ে গেল। অনেকেই শুনেছে শব্দটা। যারা শুনেছে, তারা কেউ বলতে পারলো না শব্দটা কিসের বা কোনদিক থেকে আসছিল।

একটু বেলার দিকে ভৈরব চক্রবর্তী এলেন। লম্বা পেটাই চেহারার মানুষ। ফর্সা রং। মুখ-ভর্তি কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি। মাথায় লম্বা চুল। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। গলায় ধবধবে পৈতে। পরনে গরদের থান। ইতিহাসে আর্যদের যেমন চেহারার বর্ণনা পড়েছি, ঠিক তেমনি। দেখলে একটু ভক্তিশ্রদ্ধা হয়।

বাবা ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন – 'শুনেছেন নাকি আপনি?'

'কি?'

'ঐ শব্দটা?'

ভৈরব চক্রবর্তী হেসে উঠলেন। হাসলে ওঁর দাড়ির ফাঁক দিয়ে শাদা শাদা দাঁতগুলোর খানিকটা দেখা যায়। তখন ওঁকে খুব সুন্দর দেখায়। হেসে বললেন – 'এ আর নতুন কি? প্রত্যেক শনিবারের রাত্তিতেই তো শব্দটা শোনা যায় –'

বাবা মনে করে দেখলেন, ভৈরব চক্রবর্তীর কথাটাই ঠিক। কাল

ছিল শনিবার। এর আগে যে একবার শব্দটা শোনা গিয়েছিল, সেও ছিল শনিবারের রাত্তির। বাবা অবন্তীবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। অবন্তীবাবু একটা দরকারী কাজে সদরে যাচ্ছেন। বাবা ওঁকে কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে ভৈরব চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করলেন— 'শব্দটা কোথ্‌থেকে আসে, আপনি জানেন?'

আমি আর সন্তা কাছেই দাঁড়িয়েছিলুম। ভৈরব চক্রবর্তী বললেন,—'কোথ্‌থেকে আবার! একটাই তো জায়গা। সে ওই শ্মশান। সাহেবকুঠির শ্মশান বড়ো জাগ্রত শ্মশান, বাবু। ডাকলে আর রক্ষে নেই'

৩ কার রক্ত ?

সাহেবকুঠিতে আমরা দশ বারোদিন হলো এসেছি।

শনিবারের মাঝরাত্তিরে লোহা-পেটানোর শব্দ এই নিয়ে আমি দুবার শুনলাম। সন্তা একবার। তাছাড়া, প্রথম দিনের সেই রহস্যময় ঘোড়ার অন্ধকারে ছুটে যাবার দৃশ্য তো দুজনে দেখেছি। ভাবতে গেলে গা ছমছম করে।

সন্তা পুকুরের ধার থেকে একটা ব্যাঙ ধরে তার সাপকে খাইয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলো। আমরা হাঁটতে হাঁটতে আবার পুকুরের ধারে ফিরে এলুম। পুকুরের জল কাচের মতো স্থির। উত্তর পাড়ে একটা আমলকী গাছ। সন্তা গাছে উঠে অনেকগুলো আমলকী পেড়ে আনলো। দুজনে বসে খেতে লাগলুম। বললুম—'সন্তা, এই মুহূর্তে তুই কি ভাবছিস, তা আমি বলে দিতে পারি।'

সন্তা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। বললো—'এর একটা এস্পার-ওস্পার করতে না পারলে—'

কথাটা সে এমন ভারিক্কি চালে বললো যে, আমার হাসি পেল।

'হাসলি যে ?'

আমলকী চিবোতে চিবোতে বললুম—'নাহ্, আর হাসবো না।'

'তোর কি মনে হয় না, ওই দুটো ঘটনার মধ্যে কোথায় একটা যোগ আছে ?'

'মানে ওই মাঝরাত্তিরে লোহা পেটানোর শব্দ, আর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাওয়ার মধ্যে ?'

'হুঁ—'

'তোর কি মনে হয় ?'

'কিন্তু একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস, বড়োরা কেউ এ

ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। বড়োরা বলতে আমার বাবা, তোর বাবা, ডাক্তারবাবু, তারিণীবাবু, ভৈরব চক্রবর্তী আর গাঁয়ের অন্যান্য লোক কেউ এ ব্যাপারে ভাবছে, দেখছিস? অথচ সবাই মাঝরাত্তিরে লোহা পেটানোর শব্দ শুনেছে, অন্ধকারে ঘোড়া ছুটে যেতেও দেখেছে—'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। বললুম—'পুলিশে খবর দিলে হয় না?'

'আরে ধুৎ, পুলিশ? পুলিশ কি করবে? গোয়েন্দা গল্পে পুলিশ কি কোনদিন কোন ঘটনার সমাধান করতে পেরেছে? মামুলি তদন্ত, তদন্তের রিপোর্ট—পুলিশ যা করতে পারে, তা হলো ওই। পুলিশের কথা ছেড়ে দে—'

ওর কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল। আমি অতি কষ্টে হাসি চেপে আমলকী চিবোতে লাগলুম।

'তোর বাবার একটা লাইসেন্স-করা রিভলবার আছে। ওটা যদি পেতুম, তাহলে আমি ব্যাপারটার ঠিক ফয়সালা করে দিতে পারতুম।'

'কি করে?'

'তুই দেখতেই পেতিস, কি করে?'

বলেই সন্তা উঠে দাঁড়ালো। আমিও হাতের আমলকীগুলো ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। জিজ্ঞেস করলুম—'আচ্ছা, কি হতে পারে, তোর মনে হয়?'

'অনেক কিছুই তো মনে হয়। না জেনেশুনে কিছু বলা কি ঠিক?'

'মাঝরাত্তিরে লোহা পেটানোর শব্দ! তাও আবার বেছে বেছে ঠিক শনিবার রাত্তিরে। ব্যাপারটা কেমন যেন একটু ঘোরালো মনে হচ্ছে, না?'

সন্তা আমার ওপর রেগে গেল। বললো—'তুই কলকাতার ছেলে হয়ে ওই সব শনিবার-টনিবার বিশ্বাস করিস?'

আমি বিশ্বাস করি না। তবে ওসব সংস্কার অনেক সময় বিশ্বাস না করেও পারি না।

সেদিন আর কিছু না বলে আমরা ফিরে এলুম।

ভৈরব চক্রবর্তী বৈঠকখানায় বসে বাবার সঙ্গে গল্প করে চলেছেন। আমি আসতেই ভৈরব চক্রবর্তী বলে উঠলেন—'এইটিই আপনার ছেলে? এই খোকা, শোনো, শোনো। এদিকে শোনো। আমার কাছে এসো।'

আমাকে এখনো খোকা বলে ডাকলে আমার খুব রাগ হয়। আমি পাঠভবন স্কুলের ক্লাস নাইনে পড়ি। আমি এখনো কি খোকা আছি নাকি? আমি বাবার পাশে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

'কই খোকা, এসো—'

আবার খোকা? আমি ভৈরব চক্রবর্তীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চোখ নামালুম।

বাবা বললেন—'যা। উনি কাছে ডাকছেন। গুরুজনদের কথা শুনতে হয়।'

আমি গিয়ে একটু দূরে দাঁড়ালুম। উনি তাঁর লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে আমায় হাত ধরে কাছে টানলেন। ভীষণ খরখরে ওঁর হাতের চামড়া। বললেন—'তোমার নাম কি?'

'বিল্বদল সরকার।'

'বিল্বদল? বাহ্, কী সুন্দর নাম।'

'কোন্ ক্লাসে পড়ো?'

'ক্লাস নাইনে।'

'হায়ার সেকেণ্ডারি, না স্কুল ফাইন্যাল?'

'স্কুল ফাইন্যাল।'

'আচ্ছা বেশ। বানান কর তো লুতাতন্তু।'

আমাকে কথায় কথায় কেউ পড়ার বিষয়ে প্রশ্ন করলে আমার ভালো লাগে না। মনে হয়, আমাকে ইচ্ছে করে ছোট করা হচ্ছে। আমি তখন প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও দিই না। ভৈরব চক্রবর্তীর প্রশ্নেরও আমি উত্তর দিলুম না।

'পারলে না তো?'

আমি অপমানিত বোধ করছিলুম। আড়চোখে ওঁর দিকে একবার

তাকালুম। তারপর চোখ নামিয়ে নিলুম।

'আচ্ছা বলো তো 'উর্ননাভ' মানে কি?'

আমি উত্তর দেবো না, মনে মনে স্থির করে রেখেছিলুম।

'পারবে না?'

বলে উনি খিক খিক করে হাসলেন।

'উর্ননাভ' মানে মাকড়সা, বুঝলে?'

বলেই উনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। আমি কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা চলে এলুম। বাবা বললেন—'কাল থেকে একটু বইপত্র নিয়ে পড়তে বসো। কেমন?'

আমি বাইরে এসে সন্তাকে দেখতে পেলুম না। ওর ঘরে গেলুম। সন্তা ঘরেও নেই। গেল কোথায়? খাটের নিচে কোণের দিকে সরাচাপা মাটির হাঁড়িটা রয়েছে। ওতে আছে ওর কালনাগিনী। আমার ভয় করছিল। তবু খাটের ধার ঘুরে হাঁড়িটার কাছে গেলুম। নিচু হয়ে হাঁড়ির মুখের সরাটা একটু তুলেছি, অমনি হিস্ করে সন্তার কালনাগিনী মাথা তুলে দাঁড়ালো। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরাটা চাপা দিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম। দেখলুম, দরজার কাছে সন্তা দাঁড়িয়ে। আমার বুকটা ভয়ে ধুকপুক করছে। সন্তা হেসে জিজ্ঞেস করলো—'কি রে, কামড়েছে নাকি?'

মাথা নেড়ে বললুম—'না। আর একটু হলে—'

সন্তা আমার হাতের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো—'কামড়াবে না। কিষণ খুব ভাল ছেলে।'

সন্তার কালনাগিনীর নাম কিষণ।

বললুম—'যদি কাউকে কামড়ায়?'

'বিষ হবে না।'

'হবে না?'

'কি করে হবে? কয়েকদিন পর পর ওর বিষ বের করে নিই তো।'

একটু থেমে বললো—'ধর, যদি কোনদিন বিষ বের করে নিতে ভুল হয়ে যায়, তাহলে কামড়ালে কিন্তু রক্ষে নেই—'

বাইরে রাজা কি দেখে খুব ডাকছিল। লোকজন থাকলে রাজা বড়-একটা ডাকে না। কিন্তু একা অচেনা কাউকে আসতে দেখলে ডাকে। খাঁটি অ্যাল্‌সেশিয়ানের বাচ্চা। গলায় জোর আছে।

আমরা বাইরে বেরিয়ে দেখি, ভৈরব চক্রবর্তী ওকে হাত নেড়ে কি বলছেন। আর রাজা চোখ লাল করে ওঁকে গেটের দিকে একপাও এগোতে দিচ্ছে না।

আমাদের দেখে ভৈরব চক্রবর্তী মনে একটু জোর পেয়েছেন, মনে হলো। রাজাকে বললেন—'আমি চোর না ডাকাত যে আমাকে তুই তেড়ে আসছিস?'

সন্তা রাজাকে ডেকে আনলো। ভৈরব চক্রবর্তী চলে গেলেন।

সেদিন বিকেলে সন্তা আমাকে নিয়ে মন্দিরের দিকে চললো। রাজাও চললো আমাদের সঙ্গে। মন্দিরের দিকে যাবার পথে পড়ে ইস্কুল আর গাঁয়ের জমিদার কুণ্ডুদের বাড়ি। ভৈরব চক্রবর্তীর বাড়িও পড়ে রাস্তার ডানদিকে। কুণ্ডুদের বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। ধুলো আর শেওলায় চারদিক কেমন হতশ্রী হয়ে আছে। এ রকম পোড়োবাড়ি দেখলে আমার কেমন ভয় করে। সিংদরোজাটা কারা খুলে নিয়ে গেছে। যে কেউ সহজে ভেতরে ঢুকতে পারে, বেরিয়ে আসতে পারে। চুন পলেস্তরা খসে গেছে। সিংদরোজার ওপরে, সিংহ জোড়ার মাথাগুলো নেই। মনে হচ্ছে, বাড়ির ভেতরটা খুব নির্জন, কথা বললে ভেতরের গুমোট বাতাস হয়তো হা হা করে উঠবে।

সন্তা বললো—'একবার যাবি নাকি ভেতরে?'

বললুম—'না।'

'কেন? ভয় পাচ্ছিস?'

'আজ চল্, মন্দিরের দিকে যাই। আর একদিন জমিদার বাড়ির ভেতরটা ঘুরে আসা যাবে।'

'এ বাড়ির মজা জানিস? যত সহজে ঢোকা যায়, তত সহজে বেরোনো যায় না।'

'তুই কোনদিন ভেতরে যাস নি?'

'অনেকবার গেছি। প্রথম যেদিন ঢুকেছিলুম, সেদিন অনেক চেষ্টা করেও বেরোতেই পারি না। শেষে রাত হয়ে গেল—'

'তারপর?'

'হঠাৎ হুম্ শব্দ করে কে যেন আমাকে ডাকলো, মনে হলো। আমি চারদিকে তাকাচ্ছি। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখি, একটা প্যাঁচা অন্ধকারে আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। আমি ওই দিকে চলতে লাগলুম। দরজা পেরিয়ে একটা দালান, দালানের পর আবার একটা ঘর। ঘরের পর আরো অন্ধকার একটা ঘর। চোরাকুঠিই হবে ওটা। ওখানে ঝিঁঝি ডকেছিল। মনে হচ্ছিল, কারা যেন অন্ধকারে রাশি রাশি খুচরো টাকা পয়সা গুনছে। অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে বাইরে বেরোবার পথ খুঁজছি। এমন সময় এক জায়গায় ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগলো। দেখলুম, একটা ভাঙা দরজা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি, একটা ঘর। ঘরের পর একটা বড় দালান। তারপর উঠোন, তারপর এই সিংদরোজা।'

'উঃ, তাহলে তো একটা গোলকধাঁধা—'

'গোলকধাঁধাই—'

হঠাৎ রাজা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ডাকতে লাগলো। বললুম —'আজ মন্দিরের দিকে যাই, চল্। আর একদিন এর ভেতরে যাওয়া যাবে।'

রাজাকে নিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে এগোতে লাগলুম।

রাস্তার ধারেই স্কুলের খেলার মাঠ। ওখানে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। আমাদের দেখে সন্তার বন্ধুরা খেলতে ডাকলো। সত্যি বলতে কি, ফুটবল খেলার জন্যে আমার পা নিশপিশ করছিল। কিন্তু আমাদের কি এখন খেলার সময় আছে? আমাদের কত্তো কাজ!

আমরা হাঁটতে লাগলুম। রাস্তার ধারে একটা বুড়ি কতকগুলো কাঠকুটো নিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে বুড়ি জিজ্ঞেস করলো —'তোরা কে বাবা? কোথায় থাকিস?'

সন্তা বললো—'সাহেবকুঠিতে।'

'সাহেবকুঠিতে? সাহেবকুঠির বাবু, শুনেছি, খুব ভালো লোক। তোমরা তার কে হও বাবা?'

সন্তা আমাকে দেখিয়ে বললো—'এ তার ছেলে।'

'ছেলে? বাঃ বেঁচে থাক্, বাবা। এই কাঠগুলো তোরা আমার মাথায় একটু তুলে দিবি?'

আমরা কাঠগুলো বুড়ির মাথায় তুলে দিলুম। একটা গাট্টাগোট্টা জোয়ান ছেলে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। সন্তাকে জিজ্ঞেস করলো—'কি বলছিলে তোমরা? কোথায় থাকো?'

'সাহেবকুঠিতে।'

'সাহেবকুঠির বাবুকে বলে দিও, উনি যেন শীগ্‌গির মন্দিরের সোনাদানা মন্দিরে দিয়ে দেন। আমাদের সোনাদানা ওঁর কাছে থাকবে কেন?'

ব্যাপারটা আমি শুনেছিলুম। বিষ্ণু ঠাকুরের নাকি অনেক গয়না। গাঁয়ের লোকেরা ওগুলো বাবার কাছে জমা রেখেছে। সন্তাও জানতো। সে ছেলেটার কথায় সন্তা বললো—'ও সব কথার আমরা কি জানি? বলার হয়, তোমরা বাবুসাহেবকে গিয়ে বলো। আমরা বলতে পারবো না।'

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশের কুঁড়ে ঘর থেকে আর একটা জোয়ান ছেলে বেরিয়ে এলো। ছেলেটাকে দেখে মনে হয়, খুব রাগী। অনেকদিন অসুখে ভুগলে যেমন তিরিক্ষে চেহারার হয়, তেমনি।

'কি বললে?' সন্তা আমতা আমতা করে বললো—'বললুম, আমাদের বলে কোন লাভ নেই। তোমরাই গিয়ে বাবুসাহেবকে বলো। আমরা বলতে পারবো না।'

'ঠিক আছে। তোমরা যাও। সাহেবকুঠিতে আমাদের গাঁয়ের সোনা কতদিন থাকে, দেখা যাবে। একটা বাইরের লোক সোনাগুলো নিয়ে কিনা বছরের পর বছর বসে আছে।'

বুড়িটা কাঠকুটো ফেলে রেখে ফিরে এলো।

'ভয়ে ভয়ে শ্মশানের চারদিকের উঁচু ঝাঁকড়া গাছগুলোর দিকে তাকাতে লাগলুম।'

'তা এসব কথা তোরা এদের বলছিস কেন ? এরা ছেলেমানুষ। সোনাদানার কথা এবা কি জানে ?'

বেলা পড়ে আসছিল। আমরা ওখানে আর দাঁড়িযে না থেকে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলুম। মনটা ব্যাজার হযে গেছে। শ্মশানের দিকে যেতে আমার ইচ্ছে ছিল না। সন্তা বললো—'ভৈরব চক্রবর্তী বলছিল না, শব্দটা শ্মশানেব দিক থেকে আসে। চল্ তো দেখি, কেউ শ্মশানে কাঠ কেটেছে নাকি ?'

আমি বললুম—'মানুষ যদি কেটে থাকে, তাহলে দেখতে পাবি। যদি মানুষ নয, অন্য কেউ কেটে থাকে—?'

সন্তা আমার মুখের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছু বললো না। আমরা নিঃশব্দে শ্মশানের দিকে এগোচ্ছি। আব একটুখানি পথ। বেলাও বেশি নেই। সূর্য ডোবার আগেই ফিরে আসতে হবে। রাজা শ্মশানের দিকে কি দেখে খুব জোরে তেড়ে গেল। আমবা তাকে অনেক ডাকলুম। কিন্তু ফেবাতে পাবলুম না। শেষে আমরাও ওর পেছনে ছুটতে লাগলুম। কিছুক্ষণ পরে রাজা কোথায বনেব মধ্যে হাবিযে গেল ওকে আব দেখতে পেলুম না।

শ্মশানে পৌঁছে আমরা ঘুবে ঘুবে পোড়া কাঠকযলা, মাটির হাঁড়ি, পোড়া বাঁশেব টুক্‌রো—এই সব দেখতে লাগলুম। সদ্যকাটা কোন কাঠ আমাদেব চোখে পড়লো না সন্তা হেসে বললো—'সব ধাপ্পা ! বুঝলি না ?'

আমি ভেবেচিন্তে বললুম—'সে সব চিহ্ন কি চোখে দেখা যায ?'

সন্তা আবার আমাকে খোঁচা দিল।

'তুই না কলকাতাব ছেলে ? এই সব আজগুবি কথা বিশ্বাস করিস ?'

ঠিক সেই সময বাজা কোথ্‌থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে এলো। ওর মুখে একরাশ তাজা বক্ত লেগে আছে। রক্ত দেখে আমি চমকে গিয়েছিলুম। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে গেছে। আমি ভয়ে ভয়ে শ্মশানের চারদিকের উঁচু ঝাঁকড়া গাছগুলোর দিকে

তাকাতে লাগলুম। ওদের ডালে বাদুড়গুলো পা ওপরের দিকে আর মাথা নিচের দিকে করে ঘুমোচ্ছে। তা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ভয়ে শিরশির করে উঠলো। যেন গাছগুলোর ডালে শ্মশানের কাঠ কয়লার মতো ছোপছোপ অন্ধকার বহুদিন থেকে জমে আছে। সন্তা কিন্তু সত্যি সত্যি খুব সাহসী। সে রাজার মুখে রক্ত দেখে একটুও ঘাবড়ায় নি। বললো—'রাজার কিছুই হয় নি, বুঝলি? ও হয়তো কোন বেজি বা কাঠবেড়ালীকে মেরেছে। মুখে তারই রক্ত।'

সে রাজাকে টানতে টানতে ঘাটে নিয়ে গিয়ে জল দিয়ে ওর মুখ ধুইয়ে দিল। জল দেখে রাজা ভয় পেয়ে এক দৌড়ে ছিট্‌কে পাবের ওপর এসে উঠলো। ওর মুখের রক্তের দাগ সব ওঠেনি। আমি জিজ্ঞেস করলুম—'কি রে সন্তা? ওগুলো ওর রক্তের দাগ, না অন্য কারো?

সন্তা ঘাট থেকে উঠে এসে ভুরু কুঁচকে বললো—'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

দেখলুম, রাজা জিব দিয়ে ওর মুখের রক্তের দাগগুলো নিজেই তুলে ফেলতে চেষ্টা করছে।

আমার এবার কেমন ভীষণ ভয়-ভয় করতে লাগলো। হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো কেমন রহস্যময়ভাবে নড়ছে। সেই সঙ্গে কেমন একটা হিস্ হিস্ শব্দ কোথা থেকে ভেসে আসছে।

সন্তা বললো—'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। চল্, এবার আমরা মন্দিরের দিকে যাই। একটু তাড়াতাড়ি চল্। আলো নিবে গেলে কিছুই দেখতে পাবো না।'

সেদিন মন্দিরে পৌঁছোতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মন্দিরটা আর দেখা হলো না। আমরা ফিরে এলুম। গাঁয়ের রাস্তায় সোনা নিয়ে লোক দুটোর চ্যাঁচামেচি করার কথা আমরা কাউকে কিছু বললুম না। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে সন্তাকে ডাকলুম—'সন্তা—'

'কি?'

'শব্দটা ওই পোড়ো জমিদারবাড়ির ভেতর থেকে আসছে না তো?'

'হতে পারে।'

'কেউ হয়তো রাত্তিরে লুকিয়ে জমিদারবাড়ির গুপ্তধন খোঁড়ার চেষ্টা করছে। জমিদাররা তো আগে ইংরেজদের ভয়ে মেঝের নিচে, নয় তো দেওয়ালের ভেতরে বা চোরাকুঠিতে সোনাদানা মোহর—এসব লুকিয়ে রাখতো। কেউ হয়তো তা টের পেয়েছে।'

সন্তা বললো—'তাও হতে পারে!'

'আচ্ছা সন্তা, রাস্তার ওই লোক দুটোকে তোর সন্দেহ হয় না?'

'গোয়েন্দাদের সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়।'

'আমরা তাহলে সত্যিকারের গোয়েন্দা হতে যাচ্ছি, কি বল্?'

সন্তার গলাটা ভারী শোনালো—'তুই ঠাট্টা করছিস্?'

'বিশ্বাস কর, আমি ঠাট্টা করছি না। আমার নিজেকে খুব গর্বিত মনে হচ্ছে। কলকাতায় গিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করবো। সবাই শুনে বেশ অবাক হয়ে যাবে।'

দরজার বাইরে মংলুর নাক ডাকছে। রাজা বার-দুই গরগর করে ঘুমিয়ে পড়লো। সন্তা পাশ ফিরলো। বললো—'শব্দটা যে শ্মশান থেকে আসে না, তা বোঝা গেছে। এখন মন্দির আর জমিদারবাড়ি একবার ঘুরে দেখতে হবে। যাবি আজ রাত্তিরে?'

আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। বললুম—'এই রাত্তিরে?'

'হ্যাঁ? হয় জমিদারবাড়ি, না হয় মন্দিরে—'

বললুম—'সন্তা, তুই আর যা-ই বল্, শুনতে রাজি আছি। কিন্তু এই রাত্তিরে মন্দিরে বা জমিদারবাড়ি যাবার কথা তুই বলিস না।'

'ভীতু কোথাকার!'

সন্তার খোঁচাটা আমাকে সহ্য করতে হলো। কিন্তু তারপরই সন্তা ওর নিজেরই ভুল ধরতে পারলো। বললো—'নাহ্, আজ রাত্তিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। যেতে হবে শনিবার মাঝরাত্তিরে। তাহলে ব্যাপারটা ঠিক ধরা যাবে।'

প্রস্তাবটা আমার কাছে ছিল আরো ভয়াবহ। তবু আমি তাকে বাধা দিলুম না। কি জানি, আবার সে যদি আমাকে ভীতু বলে টিটকারি দেয়। তাছাড়া, শনিবার—সে তো এখনো অনেক দেরি।

আমি এবার সাহস দেখাবার জন্যে বললুম—'কিন্তু তুই শ্মশান-টাকে একেবারে বাদ দিচ্ছিস কেন?'

'আজ তো শ্মশান দেখে এলুম—'

'এর পেছনে অদৃশ্য কিছু থাকলেও তো থাকতে পারে?'

'আগে মন্দির আর জমিদারবাড়ি খুঁজে দেখি। তারপর অদৃশ্য কিছু থাকলে তখন না হয় খুঁজে দেখা যাবে।'

সন্তা মনে মনে কিছু ভেবে নিয়ে বললো—'সামনের শনিবার মাঝরাত্তিরে আমরা কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়বো, বুঝলি? সঙ্গে একটা টর্চ থাকবে, ওটা অবিশ্যি খুব দরকার না হলে জ্বালা হবে না। আর থাকবে একটা অস্ত্র, ওটা সংগ্রহ করবার ভার থাকবে তোর ওপর। কেমন? পারবি তো?'

আমি আর কোন কথা না বলে ঘুমোবার ভান করে শুয়ে থাকলুম। সামনের শনিবার সন্তার সঙ্গে আমাকে যেতে হবে—কথাটা যত ভাবছি, ভয়ে আমি ততই কুঁকড়ে যাচ্ছি।

পরের দিন সকাল থেকে রাজা সেই-যে বারান্দায় শুয়ে থাকলো, আর উঠলো না। ওর থালায় খাবার দেওয়া হয়েছে, তাতে মাংসের

হাড়গোড়ও ছিল, রাজা কিছুই ছুঁলো না। আমি আর সন্তা ওকে বারেবারে দেখছি, সে ঘুমের ভেতর মাঝে মাঝে রাগে গরগর করে উঠছে, কিন্তু চোখ খুলছে না, উঠে দাঁড়াচ্ছেও না। তা দেখে আমার কেমন ভয় করতে লাগলো। সন্তাও যেন অন্য কিছুর সন্দেহ করতে শুরু করেছে। আমি ওকে বললুম—'কাল রাজার কেউ কিছু করে দেয়নি তো?'

সন্তা আমার মুখের দিকে তাকালো।

'কে?'

'ধর, শ্মশানে তো অনেক কিছুই থাকে।'

'ধ্যাস্! তুই থাম্‌তো। কাল, ছাখ্, ও ঠিক হয়ে যাবে।'

রাজাকে নিয়ে তবু আমার ভয় গেল না। সে মাটিতে মুখ গুঁজে যেভাবে পড়েছিল, সেভাবেই পড়ে রইলো। ভয়ে আমি কাউকে কিছু বলতেও পারলুম না।

সন্তা আমাকে আমার অস্ত্র-সংগ্রহের কথা মনে করিয়ে দিল। বললো—'এখনো সময় আছে। কিন্তু আসছে শনিবারের মধ্যে অস্ত্রটা ঠিক সংগ্রহ করা চাই।'

সন্তা আমাকে আরো কিছু হয়তো বলতো। বুলি এসে পড়ায় সে আর কিছু না বলে সোজা তার ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। বুলি বললো—'বিল্লু, কত সফেদা পেকেছে দেখ্‌বি, আয়। মিষ্টি যেন গুড়—'

'কই, দেখি—'

আমি বুলির সঙ্গে সফেদা খেতে চললুম। বুলি ঘরের ভেতর থেকে একরাশ সফেদা বের করে আনলো। সব পাকা। আমি খেতে লাগলুম। বুলির কথাই ঠিক। খুব মিষ্টি। বুলিও খাচ্ছে। আমার মন কিন্তু সফেদায় ছিল না। আমি মনে মনে বাবার সেই লাইসেন্স-করা অস্ত্রটার খোঁজ করছিলুম। সন্তা ঠিক কথাই বলেছে। সঙ্গে অস্ত্র থাকলে ভয়টাও অনেক কমে যায়, মনে বল আসে। সফেদা খেতে খেতে বুলিকে বললুম—'বুলি, একটা কথা বলবো,

কাউকে বলবি না, বল্ ?'

বুলি আমার মুখের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকালো।

'কি কথা ?'

'কাউকে বলবি না তো ?'

'না।'

আমি ফিসফিস করে বললুম – 'বাবার একটা রিভলবার আছে। দেখেছিস ?'

'দেখেছি তো ? বাবা ওটা খাটের ড্রয়াবে বেখে শোয়।'

'তাই বুঝি ? তুই ওটা সামনের শনিবার বাত্তিরে আমাকে একটু এনে দিতে পারবি ?'

'বিভলবার নিয়ে তুই কি করবি ?'

বুলির এই এক দোষ। আমার সমস্ত গোপন ব্যাপারের মধ্যে ওর নাক গলানো চাই। বললুম – 'একটু গোয়েন্দাগিরি করতে যাবো। ওটা হলে ভালো হয়।'

শুনেই বুলি কুলকুল করে হেসে উঠলো।

'তুই যাবি গোয়েন্দাগিবি করতে ? বাবার রিভলবার নিয়ে ?'

ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম – 'এভাবে হাসিস না তুই। গোপন ব্যাপার সব ফাঁস হয়ে যাবে।'

শুনে বুলি আরো হাসতে লাগলো। হাসি চাপা দিতে গিয়ে আরো জোরে হেসে সে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। আমি রাগের মাথায় একটা সফেদা হাতে নিয়ে ওর পিঠে ঠাঁই করে ছুঁড়ে মারলুম। বুলি হাসি থামিয়ে উঠে বসলো। বললো – 'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি, মাকে সব বলে দেবো।'

সব্বনাশ ! মা এসব শুনতে পেলে যে সব পণ্ড হয়ে যাবে ! বললুম – 'বুলি, তুই জানিস না, আমরা এখানে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ধরে ফেলেছি। শনিবার মাঝরাত্তিরে কিসের শব্দ হয়, জানিস ?'

বুলি ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে রইলো।

'কিসের ?'

'সেইজন্যেই তো বাবার রিভলবারটা চাই।'

বুলি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলুম—'চলে যাচ্ছিস? কিছু বললি না যে?'

'মাকে বলবো সব।'

বলেই বুলি মার ঘরের দিকে লাগালো এক ছুট্!

আমার ভয় করতে লাগলো। বুলি যদি সব বলে দেয় মাকে। আমাদের সব ফেঁসে যাবে তাহলে। উল্টে, অনেক বকুনি শুনতে হবে আমাকে। আমি তাড়াতাড়ি সন্তার কাছে গেলুম। সন্তা ঘরে ছিল না। আমি ওকে খুঁজতে লাগলুম। শেষে ঘরেব পেছনের দিকে আমগাছের ছায়ার কতকগুলি দড়াদড়ি নিয়ে ওকে বসে থাকতে দেখতে পেলুম।

'কি করছিস তুই এখানে?'

সন্তা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো—'কি করছি, বল্ দেখি তুই?'

'না বললে কি করে জানবো?'

জোরে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললো—'তুই কলকাতার নাম ডোবালি, বিল্লু—'

কলকাতার নাম রাখার দায়িত্ব কি শুধু আমার একার? বুলির ওপর আমাব রাগ হলো। সেও তো কলকাতাব মেয়ে। কলকাতার নাম রাখার ব্যাপারে তারও কি কোন দায়দায়িত্ব নেই? সন্তাকে বললুম—'নিশ্চয়ই এটা আমাদের গোয়েন্দাগিরির কোন অঙ্গ—'

'ভ্যাট্—'

'তবে কি?'

'কাক ধরবার জন্যে জাল পাতছি। খাঁচাটা খালি পড়ে আছে তো?'

হঠাৎ সন্তা গম্ভীর হয়ে গেল। বললো—'তুই ঠিক বলেছিস। কাককে ট্রেনিং দিতে পারলে গোয়েন্দাগিরির কাজ খুব ভালো হতে পারে। একটা নতুন ব্যাপার হবে তাহলে, কি বল?'

'তবে—'

আমি একটু রেল্লা নিতে লাগলুম। বললুম—'বুলিকে রিভল-বারটার কথা বলেছি। কিন্তু যদি ফাঁস করে দেয়?'

সঙ্গে সঙ্গে সন্তার মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো।

'বুলিকে ওকথা বলতে গেলি কেন?'

'বুলিই জানে, ওটা কোথায় থাকে। সেইজন্যে—'

তালুতে জিব ঠেকিয়ে সন্তা একটা চুকচুক শব্দ করলো। একটু থেমে বললো—'তোর কি মনে হয়, বুলি বলে দেবে?'

বললুম—'বুঝতে পারছি না। তবে নাও বলতে পারে।'

'তাহলে তুই একটু ওর ওপর নজর রাখিস—'

ঠিক তখনই ভৈরব চক্রবর্তীকে সাহেবকুঠি থেকে বেরিয়ে যেতে আমরা দেখতে পেলুম। লোকটা সকাল থেকে বৈঠকখানায় বাবার সঙ্গে বকবক করছিল। লোকটাকে আমার আর ভালো লাগে না। মনে হয়, দেখলেই বুঝি আমাকে কিছু একটা প্রশ্ন করবে। আমি আবার ওই সব পছন্দ করি না। আমাকে আগড়ুম বাগড়ুম প্রশ্ন করার কি প্রয়োজন আছে লোকটার?

সন্তা লোকটাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো—'ভৈরব চক্রবর্তী, না?'

বললুম—'হ্যাঁ।'

'ওই একটা লোক!'

বললুম—'ভীষণ খারাপ। লোকটাকে আমার কিন্তু খুব সন্দেহ হয়। শনিবারের মাঝরাত্তিরের শব্দে ওর কোন হাত নেই তো?'

'ধুৎ। তুই যেমন, তোর সন্দেহও তেমনি। দুনিয়ায় এত লোক থাকতে শেষে তুই কিনা একটা সামান্য পুরুত বামুনকে সন্দেহ করে বসলি? তোকে দিয়ে কিস্সু হবে না।'

আমি তখন আসল কথাটা বলেই ফেললুম—'লোকটা আমাকে দেখলেই খালি বানান জিজ্ঞেস করে।'

সন্তা হেসে উঠলো।

'ও—সেইজন্যে লোকটাকে তোর সন্দেহ হয়?'

'লোকটার চোখদুটো কেমন যেন—'

'কেমন ?'

'একটু কেমন ঘোরালো, তাই না ?'

'হু, আর কিছু ?'

'লোকটার হাতের চামড়া ভীষণ খরখরে।'

'তাই নাকি ? তাহলে তো লোকটার ওপরে একটু নজর রাখতে হয়। কিন্তু কি জানিস, লোকটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। লোকটা বড় দুঃখী রে—'

মাথার ওপর থেকে আমগাছের ছায়া সরে যাচ্ছিল। বাইরে এখন খুব গরম। আমি আর সন্তা আমার ঘরে এসে জানলার কাছে বসলুম। রাস্তা দিয়ে বুড়ো ভৈরব চক্রবর্তী ছাতা মাথায় চলে যাচ্ছেন, জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। সন্তা বলতে লাগলো—'লোকটার এখন নিজের বলতে কেউ নেই। ক'বছর আগে সাপের কামড়ে ওর বৌ মারা গেছে। ছেলেটা কাছে থাকতো। সেও বছর দুয়েক হলো রাগ করে বুড়োর কাছ থেকে কোথায় পালিয়ে গেছে, কেউ জানে না। বুড়ো বিষ্ণুর পুজো করে আর ভাইপোদের কাছে থাকে, খায়। ভাইপোরাও বুড়োকে ভালো চোখে দেখে না। বুড়ো তাই সময় পেলে আমাদের এখানে এসে সময় কাটিয়ে যায়। বাবু-সাহেব ওঁকে খুব ভালবাসেন—'

আমি রাস্তার দিকে চেয়ে বসেছিলুম। ভৈরব চক্রবর্তীর ছাতাটা গাঁয়ের বাঁকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

৫ পেছনে বিপদ, সামনে বিপদ

বিকেল হতেই সন্তা আমাকে ডাকলো – 'বিল্লু – '

আমি বেরিয়ে এলুম। রাজা মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। সে চোখ না খুলেই একবার গরগর আওয়াজ করলো।

সন্তা বললো – 'চল, আজ থেকেই আমরা আমাদের কাজ শুরু করি।'

বললুম – 'চল্ – '

এ সব কথা বলায় এবং ভাবনায় বেশ একটা রোমাঞ্চ আছে। দুজনে চলতে লাগলুম। পেছনে রাজা আবার একবার গরগর করলো।

চলতে চলতে সন্তা বললো – 'আমাদের কথাবার্তা হবে চোখের ইশারায়, নয়তো ফিসফিস করে। কক্‌খনো উঁচু গলায় কথা বল্‌বি না। বুঝলি ? সন্দেহজনক কিছু দেখলে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিবি। তেমন হলে, আমাকে বলবি। আমি দেখে নেবো। কেমন ?'

সন্তার এসব কথা শুনতে আমার একদম ভালো লাগে না। ও কি আমাকে এতই ছেলেমানুষ ভাবে ?

আমরা দুজনে বড় রাস্তায় এসে পড়লুম। আজ বড়ো গুমোট। বড় রাস্তায়ও একটুও হাওয়া নেই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা জমিদার-বাড়ির সামনে এসে পড়লুম। চুন-পলেস্তারা খসে-যাওয়া একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি। ইঁটগুলোর গায়ে ফাটল ধরেছে, ছোপ-ছোপ শ্যাওলা শুকিয়ে কালো হয়ে আছে। গেটের ওপরে মুণ্ডুহীন সিংহ দুটো থাবা উঁচিয়ে আছে।

সন্তা বললো -'কি রে, ভেতরে একবার যাবি নাকি ?'

বললুম – 'এখন গিয়ে কি লাভ ?'

'ঠিক বলেছিস। সামনের শনিবার মাঝরাত্তিরে আসবো। শব্দটা

ধরে ঠিকমতো এগোতে হবে।'

আসলে, এই ভয়ংকর বাড়িটার ভেতরে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না। সামনের শনিবার এখনো দেরি আছে। তখন দেখা যাবে, কি করা যায়। তেমন হলে যেতে হবে। কি আর করা যাবে? সন্তার পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন না গিয়ে উপায় নেই।

আমরা গাঁয়ের রাস্তায় আবার হাঁটতে লাগলুম। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা আমাদের খুব কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে। আমরা সাহেবকুঠির ছেলে। তাই ওদের এত কৌতূহল।

কাল যে জোয়ান ছেলে দুটো সোনা নিয়ে চ্যাঁচামেচি করছিল, ওদের কুঁড়েঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। কুঁড়েঘরের পাশে রাংচিতার বেড়ার ধারে ওল আর মানকচুর গাছ। তার পাশ দিয়ে কুঁড়েঘরে যাবার সরু লিকলিকে রাস্তা। ওখানে কালকের জোয়ান ছেলে একটা দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখে কুঁড়েঘরের ভেতরে চলে গেল।

সন্তা বললো—'দেখ্‌লি তো। ছেলেটা আমাদের দেখেই কেমন ঘরের ভেতরে চলে গেল? নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।'

আমি বললুম—'চোখদুটো কেমন রাগে-ভরা, দেখ্‌লি না?'

'দেখেছি। বাড়িটার ওপরে একটু নজর রাখতে হবে। ছেলে দুটোকেও—বুঝলি?'

'কিন্তু এখন যেভাবে ঘরের ভেতর গেল, কিছু নিয়ে তেড়ে আসবে না তো?'

'অত সাহস ওদের নেই। তবে কিছু বলাও যায় না। রাগী লোকদের বিশ্বাস নেই।'

'তাহলে চল্, এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাই—'

আমরা চলতে লাগলুম। যেতে যেতে সন্তা বললো—'ছেলে দুটোর ওপর কিন্তু নজর রাখতে হবে।'

রাস্তার ওদিকে একদল লোককে মন্দিরের দিকে আসতে দেখে আমি সন্তাকে বললুম—'সন্তা, ঐ ছাখ্, কারা আসছে।'

সন্তা কিছুই বুঝতে পারলো না। লোকগুলো যেমন মন্দিরের

দিকে আসছে, আমরাও তেমনি এদিক থেকে মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। লোকগুলোকে এখন আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওতে ছেলে মেয়ে বুড়ো—সবাই আছে। পোশাক-আশাকও যেন একটু অদ্ভুত। পেছনে ছই-দেওয়া একটা গোরুর গাড়ি। কারা এরা?

মন্দিরের কাছাকাছি এসেই ওরা হঠাৎ ব্যাণ্ড বাজাতে সুরু করলো। সমস্ত গ্রাম, গ্রামেব মাঠ, গ্রামের আকাশ হঠাৎ যেন জেগে উঠলো। ছেলেমেয়েরা, যে যেখানে ছিল, ছুটে বেরিয়ে এলো। ওরা হৈ-হৈ করে দল বেঁধে মন্দিরের দিকে ছুটতে লাগলো।

ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে অচেনা লোকগুলো মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা ততক্ষণে মন্দিরে পৌঁছে গেছি। গাঁয়েব ছেলে-মেয়েরা একপাশে দাঁড়িয়ে ওদেব পথ ছেড়ে দিল। ওরা ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে মন্দিবের উঠোনে ঢুকলো। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে যে যার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বেশ কসরত দেখিয়ে বাজাতে লাগলো। চারদিক গমগম করছে। একটা লোক বিরাট একটা ঢাকে দুহাতে মুগুরের মতো দুটো স্টিক্ নিয়ে প্রাণপণে পেটাচ্ছে। প্রচণ্ড তার উৎসাহ। কিন্তু ঘাড় গুঁজে ওটা পিঠে করে বয়ে চলেছে যে, আমি শুধু ওকেই দেখছি। ওর কালিঝুলিমাখা প্যাণ্টে অসংখ্য তাপ্পি মারা।

সন্তা আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো—'ঐ হচ্ছে সেরা বাজিয়ে।'

জিজ্ঞেস করলুম—'কে?'

'ঐ যে পিঠে যার ঢাক—'

আমি বললুম—'তা নয় রে। ঐ হচ্ছে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে দুঃখী।'

কিছুক্ষণ পরে বাজনা থেমে গেল। ততক্ষণে আরো ভিড় জমে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। মন্দিরের পায়রাগুলোও এখন ডাকতে ভুলে গেছে। রোগা বুড়োমতো একটা লোক চটপট মন্দিরের সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ালো। গায়ে কোঁচকানো তোবড়ানো প্যাণ্টশার্ট, গলায় তিনটে রূপোর মেডেল, মুখে কাঁচাপাকা ছাগলদাড়ি। লোকটা ওর

বড় বড় চোখে চারদিক ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে ট্রেনের কামরায় ফেরিওলাদের মতো বক্তৃতা সুরু করলো—'আমি সীতারাম সার্কাসের সীতারাম বলছি। অনেক বছর আগে আমি এখানে বাবুদের খেলা দেখিয়ে গেছি। আপনারা যাঁরা আমার খেলা দেখেছেন, নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন। এবাব নতুন নতুন খেলোয়াড় নিয়ে এসেছি। আর কিছু নয়, আপনাদের দুদিন আনন্দ দিয়ে আবার চলে যাবো। কাল থেকে আমরা আমাদের খেলা দেখাবো। আমাদের দলে আছে ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত সব খেলোয়াড়, আছে একটি ছাগল, দুটি বাঁদর, একটি ঘোড়া, একটি চিতাবাঘের বাচ্চা ; আর আছে, এই আমি সীতারাম। টিকিটের দাম মাত্র দশ পয়সা।'

সঙ্গে সঙ্গে আবাব ব্যাণ্ড বেজে উঠলো। আর তার তালে তালে বুড়ো নিচে নেমে এসে নাচতে লাগলো, নাচতে নাচতে খুব দ্রুত ভল্ট্ খেতে লাগলো।

আমরা কেউ দেখিনি, সিঁড়ির মাথায় ভৈরব চক্রবর্তী কখন এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ইশারায় সীতারামকে কাছে ডাকলেন। সীতারাম একটা জোয়ান লোকের মতো লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপব ভৈরব চক্রবর্তীর পায়ের কাছে লুটিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

ভৈরব চক্রবর্তীর সঙ্গে সীতারামের কি কথা হলো, শোনা গেল না। সীতারাম নেমে এসে হাত তুলে ইশারা করতেই বাজনা থেমে গেল। তারপর লোকগুলো উঠোনেব একপাশে উৎসাহভরে তাঁবু খাটাতে লেগে গেল।

কোন্ ফাঁকে মন্দিরের পেছনে সূর্য ডুবে গেল, বুঝতে পারিনি। উঠোনে লোকজনের ভিড় কমে আসতেই বুঝতে পারলুম, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সীতারাম সার্কাসের লোকেরা এখানে-ওখানে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছে। একপাশে সীতারাম বসে গাঁজার কলকেয় টান মারছে। কয়েকটা লোক একদিকে মাটিতে উনুন খুঁড়ে রান্নার আয়োজন করছে।

ঠিক তখনই সন্তা চোখ টিপে আমাকে মন্দিরের চারদিক ঘুরে দেখতে ইশারা করলো। আমি আর সন্তা সেইমতো এগোতে লাগলুম। ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখবো, এতে কারো আপত্তি থাকবে কেন? আমরা তো চুরি করছি না। আবছা অন্ধকারের দিকে আমরা যেই পা বাড়িয়েছি, অমনি একটি বাজখাঁই গলা আমাদের শাসিয়ে উঠলো—'কে ওখানে?'

আমি চিনতে পারলুম, এটা ভৈরব চক্রবর্তীর গলা। আবছা অন্ধকারে থামের আড়ালে আমরা ওঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। সেই অন্ধকারে ওঁর চোখদুটো যেন জ্বলছে।

সন্তা ভয়ে ভয়ে উত্তর করলো—'এই যে আমরা—'

'আমরা কারা?'

'সাহেবকুঠির ছেলে।'

'সাহেবকুঠির ছেলে তো, ওদিকে কেন যাচ্ছ?'

'মন্দির দেখতে।'

'মন্দির কি পেছনে আছে?

'আমরা চারদিকই দেখবো।'

আমি সন্তার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এতক্ষণ ভৈরব চক্রবর্তীর মুখে মুখে জবাব দিয়ে যাওয়া কী কঠিন কাজ, সে আমি জানতুম। কিন্তু সন্তা একটুও নার্ভাস হয়নি, একটুও রেগে যায়নি। একভাবে সে ভৈরব চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল। দেখলুম, ভৈরব চক্রবর্তীর গলাটা একটু নরম হলো।

'মন্দির দেখবে তো মন্দিরের পেছনে কি? ঠাকুর কি মন্দিরের পেছনে থাকে?'

সন্তা ভৈরব চক্রবর্তীর ভুল ধরিয়ে দিল। বললো—'আমরা তো ঠাকুর দেখতে আসিনি! এসেছি, মন্দির দেখতে—'

ভৈরব চক্রবর্তীকে মনে হলো, উনি যেন রাগের মাথায় কথার খেই হারিয়ে ফেলেছেন।

'অ—ঠাকুর দেখতে আসোনি, এসেছো মন্দির দেখতে?'

তারপর গলাটাকে নরম করে বললেন – 'এই রাত্তির বেলা মন্দিরের আর কি দেখবে ? কি-ই বা আর দেখার আছে এই মন্দিরের ? সবই তো ভেঙেচুরে গেছে। ওদিকটা এখন অন্ধকার। অন্ধকারে ঝোপ-জঙ্গলে আর ভাঙা ইঁটের ডাঁইয়ের ভেতর সাপখোপ রয়েছে। আমি তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছিলুম। তাছাড়া, তোমরা হচ্ছ সাহেবকুঠির ছেলে। তোমাদের ভালমন্দ তো আমাকে দেখতেই হবে।'

সন্তা আমার হাত ধরে ফিরে চলে আসছিল। ভৈরব চক্রবর্তী বললেন – 'চলে যাচ্ছ কেন ? বসো, আরতি করছি। দেখে যাও –'

আমরা সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের চাতালে উঠে গেলুম। ভৈরব চক্রবর্তী সন্তার হাতে ঘণ্টার দড়িটা ধরিয়ে দিয়ে দরজা খুলে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে দেশলাই ঠুকে পিদিম জ্বাললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরতি শুরু হয়ে গেল। সীতারাম সার্কাসের ছেলেমেয়েরা মন্দিরের সিঁড়িতে ভিড় করে দাঁড়ালো। ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের দিকে পেছন ফিরে আরতি করছেন। সন্তা জোরে জোরে ঘণ্টার দড়ি টানছে। ঘণ্টা বাজছে – ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ –

একটু পরেই সে আমাকে ইশারায় পাশে ডাকলো। আস্তে আস্তে ঘণ্টার দড়িটা ওর হাত থেকে আমার হাতে চলে এলো। ঘণ্টা যেমন বাজছিল, তেমনি বেজে চললো – ঠন্ ঠন্ ঠন্ ঠন্ –। একটুকুও তাল কাটেনি। সেই ফাঁকে সন্তা মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তারপর অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল, ওকে আর দেখতে পেলুম না।

ভৈরব চক্রবর্তী অনেকক্ষণ ধরে আরতি করলেন। তাঁর আরতি শেষ হবার আগেই সন্তা ফিরে এলো। তালে তালে ঘণ্টা বাজার ফাঁকে ঘণ্টার দড়িটা নিঃশব্দে আবার হাত-বদল হয়ে গেল। ভৈরব চক্রবর্তী তার কিছুই বুঝতে পারলেন না।

আরতি শেষ হলে ভৈরব চক্রবর্তী সবার হাতে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ খেয়ে আমরা সাহেবকুঠির দিকে রওনা দিলাম।

বাইরে অন্ধকার যত গাঢ় হবে ভেবেছিলুম, তত গাঢ় ছিল না। পশ্চিম আকাশে কাজুবাদামের শাঁসের মতো একফালি চাঁদ

ঝুলে ছিল। তার আলোয় পথ হাঁটতে আমাদের কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে সন্তা বললো—'মনে হচ্ছে, শনিবারের মাঝরাত্তিরের শব্দটার একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি—'

আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলুম।

'পেয়েছিস? কোথায়? কি দেখেছিস?'

সন্তা খুব রেল্লা দিতে লাগলো। বললো—'আরো খুঁজে দেখতে হবে। মনে হচ্ছে, সব বেরিয়ে যাবে। তুই ঠিক ধরেছিস—'

'কি?'

'ভৈরব চক্রবর্তী লোকটা খুব সুবিধের নয়।'

'তুই তো তখন বিশ্বাস করতেই চাস নি।'

'প্রমাণ না পেলে কি করে বিশ্বাস করি, বল্?'

'এখন প্রমাণ পেয়েছিস?'

'মনে হচ্ছে, একটা পেয়েছি।'

'সেটা কি?'

'পরে বলবো। এখন ওটা গোপন থাকা ভালো।'

কথাটা শুনে আমার আত্মসম্মানে ভীষণ লাগলো। একসঙ্গে বিপদেব ঝুঁকি নিযে কাজ করছি। তবু সন্তা আমাকে বিশ্বাস করে কথাটা বলতে পারলো না? তাছাড়া, শব্দটা তো আমিই আগে শুনেছিলুম। তার কারণটা জানার অধিকার সবার আগে আমারই থাকা উচিত। আমি মনে মনে রাগ করে বললুম—'তুই আমাকে অবিশ্বাস করছিস?'

'অবিশ্বাস নয় রে, অবিশ্বাস নয়। ব্যাপারটা আমাকে আরো একটু তলিয়ে বুঝে নিতে দে। তাবপর সব তোকে বলবো।'

আমি সন্তার কথায় খুব খুশী হতে পারলুম না। সন্তাও আমাকে আর খুশী করবার কোন চেষ্টাই করলো না। কিছুক্ষণ আমি কোন কথাই বললুম না। সন্তাও না।

গাঁয়ের ভেতরে ঢুকতে যাবার আগে সন্তা জিজ্ঞেস করলো—'তোর কি ক্ষিদে পেয়েছে খুব?'

বললুম—'না। প্রসাদ খেয়েছি তো।'

'তাহলে আর একটা কাজ করতে হবে।'

'কি?'

'কালকের ছেলে দুটোকে একটু নজর করতে হবে। ছেলে দুটোর সঙ্গে ভৈরব চক্রবর্তীর কোন যোগ আছে কিনা দেখতে হবে। কি বল্?'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে আমরা কিছুক্ষণ ওদের কুঁড়ের পেছনে ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থাকবো। দেখি, ভৈরব চক্রবর্তী ওদের কাছে আসে কিনা বা ওরা ভৈরব চক্রবর্তীর কাছে যায় কিনা—'

ভৈরব চক্রবর্তীর কথাটা আমার মনে ছিল। ঝোপের ভেতরে যদি সাপখোপ থাকে?

বললুম—'ঝোপের ভেতরে কোন সাপখোপ নেই তো রে?'

সন্তা আমাকে সাহস দিল—'তুই থাম্ তো। জেনে রাখিস, সাপের গায়ে আগে আঘাত না লাগলে ওরা কক্‌খনো গায়ে পড়ে কামড়ায় না। সব সময় ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার জন্যেই ওরা কামড়ায়।'

ছেলে দুটোর কুঁড়েঘরটার পেছনে পৌঁছতেই সন্তা আমার হাতে একটু চাপ দিল। অমনি আমরা দুজনে পা টিপে টিপে ওদের রাংচিতার বেড়ার ধারে ওল আর মানকচুর গাছগুলোর নিচে অন্ধকারের ভেতর গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইলুম। কেউ কোন কথা বলছি না। আস্তে আস্তে নিশ্বাস নিচ্ছি, ছাড়ছি। রাস্তার দিকে দু'জোড়া চোখ জ্বেলে বসে আছি। কখন ভৈরব চক্রবর্তী আসে বা ছেলেদুটোর কেউ কুঁড়েঘর থেকে বেরোয়।

ওল আর মানকচুর গাছগুলোর নিচে ভীষণ রকমের গুমোট গরম। একটুও হাওয়া নেই। তার ওপর মশা কামড় বসিয়ে দিচ্ছে হাতে, পায়ে, ঘাড়ে। মারবার উপায় নেই। নড়াও বারণ। তাছাড়া, জোঁক-টোঁক আছে কিনা কে জানে? ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা!

কুঁড়েঘরের ভেতরে কারা কথা বলছে, মনে হলো। আমি ঘাড় কাত করে পশ্চিম দিকের আকাশে তাকালুম। মানকচুর বড় বড়

পাতায় আকাশটা ঢাকা পড়ে গেছে। অতি কষ্টে চাঁদের ফালিটাকে খুঁজে বের করলুম। চাঁদটা তখন ডুবতে যাচ্ছে। ডুবুক। আমরা আজ সাহেবকুঠির একটা কারসাজির জট খুলতে লেগে গেছি। শনিবারের মাঝরাত্তিরে লোহা-পেটানোর মতো যে শব্দ হয়, সাহেব-কুঠির সবাই জানে ওটা কোন ঠাকুরদেবতার কাজ। আমরা প্রমাণ করে দেব, না, তা নয় : এটা মানুষেরই কারসাজি। আমাদের প্রমাণ দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে। সন্তাও আর আমাকে ভীতু বলে টিট্‌কারি দেবে না। বুলিও আমাকে যথেষ্ট সমীহ করবে। ওটা কী কম কথা! এসব কথা ভাবতে ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা দিল।

আমার ঘাড়ে একটা মশা বসে অনেকক্ষণ থেকে কামড়াচ্ছে। আমি ওটাকে মারবো বলে হাত তুললাম। অমনি সন্তা আমার হাতটা ধরে ফেললো। নিশ্চয়ই কোন সাড়াশব্দের টের পেয়েছে সে। আমি কান পেতে বসে রইলুম। ঘাড়ে মশাটা বসে এক নাগাড়ে রক্ত শুষে খাচ্ছে। নাকের কাছে আবার একটা মশা উড়ছে, কোথায় বসবে ঠিক করতে পারছে না। আমি আবার হাত তুললাম। সন্তা আবার হাতটা ধরে মাটির ওপর নামিয়ে দিল।

আমি কান খাড়া করে বসে আছি। কুঁড়েঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। ঠিক তখনই মশাটাও সুড়ুৎ করে আমার নাকের ভেতর ঢুকে পড়লো। আমি সজোরে হেঁচে ফেললুম।

'কে রে ওখানে?'

কালকের সেই জোয়ান ছেলে একটার গলা।

আমরা আর দেরি না করে ঝোপঝাড় ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে এসে দে ছুট!

আমরা মরি-বাঁচি করে সাহেবকুঠির দিকে পাশাপাশি ছুটছি। পেছনে আমাদের ধরবার জন্যে কে যেন ছুটে আসছে। তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সম্ভবত, কালকের সেই ছেলে দুটোর একটাই হবে। ধরতে পারলে রক্ষে নেই। তখন সাহেবকুঠির ছেলে বলে আমাদের কিছু না বলে ছেড়ে দেবে না ও।

বাঁদিকে পোড়ো জমিদার-বাড়ি। সন্তা আমাকে বললো—'চল্, ওই গোলকধাঁধার ভেতরে সেঁধিয়ে যাই। তাহলে আর খুঁজে পাবে না।'

আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অতি কষ্টে বললুম—'ও কাজ করিস না, সন্তা। তাহলে ওখানে ঠিক আজ রাত্তিরে আমরা মরে যাবো।'

সন্তা আর কিছু বললো না। আমাকে পাশে নিয়ে উঁচুনিচু গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সোজা ছুটতে লাগলো। আমার পায়ে ছিল নতুন চটি। এখানে আসার আগে মা ভবানীপুরের বাটার দোকান থেকে কিনে দিয়েছিলেন। তার একপাটি হঠাৎ ছুটে অন্ধকারে কোথায় বেরিয়ে গেল। আমি বললুম—'সন্তা, আমার চটি—'

সন্তা বললো—'গেছে, যাক্। আগে প্রাণে বাঁচি, পরে চটি—'

পায়ে একপাটি চটি নিয়ে ছোটা যে কী কষ্ট, যে জানে না, সে বুঝতে পারবে না। হারানো পাটিটার জন্যে দুঃখ হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। সন্তা বলেছে, আগে প্রাণ, তারপর চটি। ছুটতে ছুটতে আমরা গ্রাম পেরিয়ে এসেছি। তারার আলোয় রাস্তা একটু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পেছনে পায়ের শব্দ থামেনি। ওটা সমানে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ সামনে কিসের একটা শব্দ শুনে আমরা ওদিকে তাকালুম। কালো মতন কি একটা আমাদের দিকে খুব দ্রুত ছুটে আসছে। তার খটাখট শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। সন্তা বললো—'সব্বনাশ! এদিকে ঘোড়া! রাস্তা থেকে নেমে পড়। তুই ওদিকে, আমি এদিকে—'

আমি টাল সাম্‌লাতে না পেরে সন্তা যেদিকে নেমে গিয়েছিল, সেদিকেই হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়লুম। সন্তাও আমার পাশে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। দুজনে দেখলুম, একটা অন্ধকারের পাহাড় সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার খুরের শব্দটাও রাস্তাটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে গাঁয়ের দিকে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমরা গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়,

দেখতে লাগলুম, কেউ আমাদের ধরবার জন্যে আর ছুটে আসছে নাকি। সন্তা গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো—'আর আসবে না। ঘোড়ায় ওকে খেদিয়ে নিয়ে গেছে।'

সন্তা এবার আমার গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলো—'লাগেনি তো কোথাও?'

বললুম—'চটিটা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, সন্তা?'

সকালে রাজা সাহেবকুঠির রাস্তায় মনের আনন্দে ছুটোছুটি করছিল। আমি আর সন্তা আমার চটি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লুম। রাজাও আমাদের সঙ্গে চললো। অনেক খুঁজলুম আমরা। কিন্তু চটিটার আর কোন হদিশ পেলুম না।

চটিটার জন্যে বড় দুঃখু হলো। আহা, আমার অমন সুন্দর চটিটা!

শেষে আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এলুম।

কিছুক্ষণ পরে ভৈরব চক্রবর্তী সাহেবকুঠিতে এলেন। ওঁর সঙ্গে গাঁয়ের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন লোক। সবাই বৈঠকখানায় এসে বাবাকে ঘিরে বসে পড়লো। বাবা সকাল থেকেই একটু ব্যস্ত ছিলেন। কোথাও যাবেন বোধ হয়। কোথাও যাবার কথা থাকলে বাবা একটু বেশি রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবু বাবা ওদের বসতে বললেন।

সন্তা আমাকে আসতে ইশারা করে জানলার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি ওর ইশারা মতো জানলার ওপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনতে লাগলুম।

সন্তা আমার কানে কানে বললো—'ওই গুণ্ডা ছেলে দুটোও এসেছে রে। ওই-যে ওপাশে—'

ছেলে দুটো আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। আমরা ওদের পাত্তা দিলাম না। শুধু ভয় হচ্ছিল, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে বাবার কাছে কিছু বলতে আসেনি তো?

ভৈরব চক্রবর্তী বললেন—'ওরা আপনার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছে।'

বাবা বললেন—'বলুন—'

ভৈরব চক্রবর্তী এবার ওদের আর্জির কথা বলতে বললেন। কিন্তু কেউ কোন কথা বলতে রাজী নয়।

তখন ভৈরব চক্রবর্তী বললেন—'কাল সীতারাম সার্কাসের দল এসেছে, শুনেছেন হয়তো।'

'না, শুনিনি।'

'ওরা ক'দিন মন্দিরের সামনে সার্কাসের খেলা দেখাবে।

'বেশ তো। দেখাক্, না—'

'গাঁয়ের লোক, পাশাপাশি গাঁয়ের লোক—সবাই—সার্কাসের খেলা দেখতে আসবে। ওরা সবাই বিষ্ণুর গায়ের গয়না দেখতে চাইবে।'

'ওই-যে বললেন, ওরা সার্কাসের খেলা দেখতে আসবে। বিষ্ণুর গায়ের গয়না দেখার কথা আবার বলছেন যে?'

এবার ওই কালো গুণ্ডা ছেলেটা হাতের আঙুল নেড়ে বলে উঠলো—'এত কথার দরকার কি? গ্রামের গয়না আপনার কাছে আছে, আমরা গ্রামের মানুষ ফেরত নিতে এসেছি। দিয়ে দেবেন—ব্যস্ এত কথার কোন দরকার নেই।'

আমরা ভেবেছিলুম, একথা শুনে বাবা রেগে যাবেন। কিন্তু বাবা একটুও রাগ করলেন না। তিনি হেসে জবাব দিলেন—'কে বলেছে ওগুলো গ্রামের গয়না নয়? আর আমি কি বলেছি, ওগুলো ফেরত দেবো না?'

সবাই চুপ।

ভৈরব চক্রবর্তী বললেন—'ও কিছু জানে না। আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ছেলেমানুষ—'

বাবা এবার গম্ভীরভাবে বললেন—'তাহলে এসব কথা ওঠে কি করে? আমি তখনই বলেছিলাম, এসব আমার কাছে রাখবেন না। এত টাকা দামের সোনা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপনারা তো নিশ্চিন্তে আছেন। আমি কেন আপনাদের সোনা পাহারা দেবো? আপনাদের সোনা আপনারা দয়া করে নিয়ে যান। এবার অন্য

কোথাও রাখার ব্যবস্থা করুন। আমি আর রাখতে পারবো না।'

বাবা ওদের আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পনেরো পরে উনি মংলুকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। মংলুর হাতে স্টীলের একটা সুটকেস। মংলু টেবিলের ওপর সুটকেসটা রেখে বেরিয়ে এলো। বাবা পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন। ওপরে নীল রঙের একটা খাতা। বাবা খাতাটা হাতে নিয়ে ভৈরব চক্রবর্তীকে বললেন—'নিন্, মিলিয়ে নিন্—'

ভৈরব চক্রবর্তী এগিয়ে এলেন। বাবা বলে যেতে লাগলেন—'মাথার মুকুট, কানের কুণ্ডল, গলার কণ্ঠহার, হার তিনগাছি, হাতের রিস্টলেট একজোড়া, বাজু একজোড়া, মেখলা—'

ভৈরব চক্রবর্তী লিস্ট ধরে মিলিয়ে নিলেন। আমরা অবাক হয়ে গয়নাগুলো দেখছিলাম। কত বড় বড় গয়না। নিশ্চয়ই অনেক সোনা। শুনেছিলুম, সাহেবকুঠির জমিদাররা এই সব গয়না তৈরি করিয়ে বিষ্ণুর মূর্তিকে একদিন সাজিয়েছিল। যাক্, সে সব কথা। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—'হয়েছে তো?'

ভৈরব চক্রবর্তী বললেন—'হবে না কেন? আপনি যে কি বলেন—'

বাবা ভৈরব চক্রবর্তীর মুখের দিকে এবার সরাসরি তাকালেন।

'আমি কি বলছিলাম, জানেন? সোনার এই দুর্মূল্যের দিনে মন্দিরে এতখানি সোনা রাখা ঠিক হবে না। বহু লোকজন আসবে—নানা চরিত্রের সব মানুষ। তাছাড়া, সোনার প্রতি লোভ সব মানুষেরই আছে। মন্দিরে উপযুক্ত সিকিউরিটির ব্যবস্থা না করে ওখানে সোনা রাখা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না আপনাদের। এ ক'দিনের জন্যে আপনারা বরং পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন।'

ভৈরব চক্রবর্তী হাসলেন।

'তার দরকার হবে না, বাবুসাহেব। যে-কোন উৎসবে মূর্তিকে সোনার গয়নায় সাজানো এখানকার বহুদিনের রীতি। কোনদিন একতিল সোনা কোথাও যায়নি। দেবতার সোনায় কে হাত দেবে,

বাবুসাহেব ?

'সে আপনারা ভালো বুঝবেন। আমার যা বলার বললাম।'

বাবা একটু কি ভাবলেন। বললেন—'তখনই বলেছিলাম, যা সোনা আছে, তা বিক্রি করে গ্রামে দিব্যি একটা হাসপাতাল তৈরী করা যায়। বহু গরীব দুঃখীর তাতে উপকার হতো। আপনারা তো আমার কথা শুনলেন না।'

ভৈরব চক্রবর্তী মাথা নাড়লেন।

'গাঁয়ের মানুষই দেবতার সোনা নিয়ে ওভাবে নষ্ট করতে চায় না।'

'হাসপাতাল করলে সোনা নষ্ট হবে না, চক্রবর্তী মশাই। সোনার তাতে সদ্ব্যবহারই হবে।'

ভৈরব চক্রবর্তী এবং অন্যান্যেরা স্টীলের সুটকেস আর চাবি নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। অবন্তীবাবু একখানা কাগজ এনে বললেন—'চলে যাচ্ছেন যে। এখানে একটা করে সই করে দিয়ে যান।'

ভৈরব চক্রবর্তী বললেন—'আবার সই করতে হবে কেন ?'

অবন্তীবাবু বললেন—'সোনা বুঝে নিয়ে গেলেন। সই করে দিয়ে যাবেন না ?'

অবন্তীবাবু সবাইকে ধরে ধরে সই করিয়ে নিলেন। যারা সই করতে জানে না, তারা টিপসই দিয়ে গেল।

খানিক পরে সাহেবকুঠি ফাঁকা হয়ে গেল। গাঁয়ের লোকেরা সোনা নিয়ে চলে গেলে কুঠির সবাই যে-যার কাজে চলে গেল। বাবা আর অবন্তীবাবুও জগদ্দল জিপে চড়ে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

সন্তা বললো—'কিছু বুঝতে পারলি ?'

বললুম—'বুঝতে না পারার কি আছে ? মন্দিরের সোনা বাবার কাছে ছিল, ওগুলো ওরা নিয়ে গেল।'

সন্তা বললো—'কেন নিয়ে গেল, জানিস ?'

'হুঁ, জানি। সার্কাস দেখতে লোকজন আসবে, ওরা ঠাকুরের গায়ে সোনা দেখে জানবে, মন্দিরের সোনা সব ঠিক আছে।'

সন্তা একভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বুঝতে

পারলুম, জবাবটা ওর মনের মতো হয়নি। জিজ্ঞেস করলুম—'তোর কি মনে হয়?'

সন্তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো।

'আজ থেকে মন্দিরে হবে সীতারাম সার্কাস, সাহেবকুঠির গাঁয়ে হবে আর একটা সার্কাস। সীতারাম সার্কাসের চেয়ে এ সার্কাসটা হবে বেশি মজাদার।'

আমি তখনও বুঝতে পারিনি, আমরাও কিভাবে ঐ সার্কাসের খেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি—সীতারাম সার্কাসের সীতারামের মতো আমরাও ওতে একটা খেলা দেখাতে চলেছি।

সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের রাস্তায় সীতারাম সার্কাসের ব্যাণ্ড বেজে উঠলো। তার বাজনা দূর থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। ওরা যখন আমাদের কুঠির সামনে পৌছলো, তখন আমি আর সন্তা ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেলুম। বুলি কখন থেকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাও উঠোনে নেমে এসে ওদের দেখছিলেন। সীতারাম সবার সামনে মুখে চোঙা লাগিয়ে সুবর্ণ সুযোগের বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের কুঠির সবচেয়ে বেশি যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে বাজা। সে লাফালাফি দাপাদাপিতে সমস্ত কুঠিটাকেই সরগরম করে তুললো। মনে হলো, এই বুঝি সে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে একটা হুলুস্থুলুস রকমের সার্কাস বাধিয়ে বসে। আমরা ভয়ে কুঠির গেট বন্ধ করে দিলুম।

বিকেল হতেই গাঁয়ের রাস্তায় লোক ভেঙে পড়লো। পাশাপাশি গাঁয়ের লোকজনও পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে চলেছে। হবে না কেন? ওখানে তো কলকাতার মতো সিনেমা-থিয়েটার নেই। একটু কিছু হলেই ভিড় জমে যায়।

সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলো হ্যাজাক জ্বলে উঠেছে মন্দিরের সামনে। এবার আকাশ ফাটিয়ে ব্যাণ্ড বেজে উঠলো। টিকিট কাটার জন্যে ভিড়, তাঁবুতে ঢোকার জন্যে ভিড়। বাইরে চা, তেলেভাজা, ফুলুরির দোকান—সেখানেও ভিড়। আমরা আগেভাগে

একটু উঁচু জায়গা বেছে নিয়েছিলুম। আমরা মানে আমি, সন্তা আর বুলি। খেলা শুরু হলো। তালে তালে বাজনা বাজছে। বাঁদরেব খেলা, ছাগলের খেলা, চিতাবাঘের বাচ্চার খেলা, দড়ির খেলা, বারের খেলা, আগুনের খেলা, লক্ষ্যভেদ—এসব বেশ জমেছিল। কিন্তু সব চেয়ে বেশি জমেছিল ঘোড়ার নাচ। সার্কাসের দলে কোন ঘোড়া ছিল না। কিন্তু সীতারাম কাল থেকে বলে আসছে ঘোড়ার নাচের কথা। কথাটায় আমার তাই একটু খট্‌কা লেগোছল। কিন্তু খেলার আসরে যখন একটা ঘোড়া লাফাতে লাফাতে এলো, তখন আর কোন সন্দেহ রইলো না। প্রথমে ঘোড়াটা হাঁটু মুড়ে বসে সবাইকে নমস্কার করলো। তারপর বাজনার তালে তালে উঠে দাঁড়ালো। তারপর শুরু হলো নাচ। কত রকমের, কত ভঙ্গির সেই নাচ। ঘোড়ার এমন নাচ আমি জীবনে কখনো দেখিনি। কাঠের মুখ, গা-টা আস্ত একটা ঘোডার ছালের। পেছনে লালচে রঙের মোটা একটা ল্যাজ। পেট সেলাই করা। লালচে রঙের ফুলপ্যাণ্টপরা দুটো লোক—একজন সামনের পায়ের কাছে, অন্যজন পেছনের পায়ের কাছে মাথা সেঁধিয়ে দিয়ে বাজনার তালে তালে নাচছে। ওরা দুজনেই ঘোড়ার চারখানা পায়ের কাজ দেখাচ্ছে। সামনের লোকটা হাত দিয়ে ঘোড়ার মুখটা আর পেছনের লোকটা ওর ল্যাজটা উঁচুতে ওঠাচ্ছে, নিচে নামাচ্ছে কিংবা এদিক-ওদিক নাড়াচ্ছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা এমন নিখুঁত যে, মনে হচ্ছে, সত্যি-সত্যি একটা ঘোড়াই নাচছে। এবং তাতে তার এক-একটি ভঙ্গি সুন্দরভাবে ফুটে উঠছে। লোক দুটোর চারখানা পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। তালে তালে ওদের পা পড়ছে, ঘুঙুরও বাজছে তালে তালে।

আমি হলফ করে বলতে পারি, ঘোড়ার এ রকম নাচ কেউ কখনো দেখেনি। দর্শকেরা সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। হাসতে হাসতে আমার দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা হয়েছিল। বুলি তো হাঁ করে শুধু হাঁপাচ্ছিল। মুখ দিয়ে আওয়াজ বের করার ক্ষমতা ছিল না ওর। সন্তা কিন্তু চুপ। সে কি ভাবছিল, কে জানে?

ঘোড়াটা মাঝে মাঝে সামনের দিকের বাচ্চাগুলোকে বড় ভয় দেখাচ্ছিল। পিছিয়ে গিয়ে নাচতে নাচতে মাথা নেড়ে হাঁ করে ওদের দিকে একবার তেড়ে যাচ্ছিল। মুখে চিঁহি শব্দ। যাকে হ্রেষা বলে। বাচ্চাগুলো ভয় পেয়ে আঁত্‌কে উঠছিল মাঝে মাঝে।

এইটেই ছিল শেষ খেলা। অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়াটা নাচলো। তারপর এক সময় ওটা ছুটে বেরিয়ে গেল। সবাই চাইছিল, ঘোড়াটা আবার আসুক, আরো একটু নাচ দেখাক্। কিন্তু ঘোড়ারও তো ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে। ঘোড়াটা আর এলো না। খেলা শেষ হলো।

ভিড় কমতে শুরু করলো। অন্ধকার গাঁয়ের রাস্তা ধরে সবাই যে যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে। আমরা তাঁবুতে তাঁবুতে উঁকি মেরে দেখতে লাগলুম। একটা তাঁবুতে ঘোড়া-নাচিয়ে লোক দুটো ঘোড়ার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তখন হাতে পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে। ঘেমে-নেয়ে ওরা একেবারে একশা।

সন্তাকে বললুম—'এবার বাড়ি যাই, চল্—'

সন্তার এখন বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। সে আমাদের সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের চাতালে উঠে গেল। সামনে ভৈরব চক্রবর্তী।

'কি চাই?'

'কিছু না।'

'তবে?'

'দেখছি—'

'কি দেখছো?'

'ঠাকুর।'

ভৈরব চক্রবর্তী আর কোন কথাই বললেন না। আমরা বিষ্ণুমূর্তির গায়ে সোনার গয়নাগুলো দেখতে লাগলুম। কত গয়না! কত সোনা! একটা প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের আলোয় গয়নাগুলো ঝকমক করছে!

পরের দিন সকালে সন্তা বললো—'চল্, একটু ঘুরে আসি।'

জিজ্ঞেস করলুম—'কোথায় ?,

'মন্দিরের দিকে ।'

বুলি বললো—'আমিও তাহলে তোমাদের সঙ্গে যাবো ।'

সন্তা বললো—'না ।'

আমি বললুম—'যেতে চাইছে যখন, যাক্ না—'

সন্তা মাথা নাড়লো। বললো—'কখন কি হয়, বলা যায় না। বুলি থাক, পরে যাবে ।'

সন্তা আমাব প্রায সমবয়সী হলেও অনেক সময় ওর কথার ওপর কথা বলা যায় না। আমি আব বুলিব যাবাব জন্যে কিছু বললুম না। বুলিও মন খারাপ করে চলে গেল।

এত কিছুর মধ্যেও আমি কিন্তু আমার চটিটার কথা ভুলতে পাবছি না। পাযে চমৎকার ফিট করেছিল। সুন্দর মানাতো পায়ে সন্তাকে বললুম—'সন্তা, তোর কি মনে হয, চটিটা আর আমি ফিরে পাবো না ?'

সে শুধু বললো—'দেখা যাক্ ।'

'একেবারে নতুন চটিটা—'

'পাওয়া যাবে। তবে দেরি হবে ।'

চটিটা পাওয়া যাবে শুনে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। জিজ্ঞেস কবলুম—'কবে পাওযা যাবে ? কত দেবি ? কলকাতায় ফিবে যাবার আগে পাওয়া যাবে তো ?'

'তুই এত ঘাব্ড়াচ্ছিস কেন ?'

'ঘাবড়াবো না ?'

'কলকাতায গিয়ে আর একপাটি কিনে নিস্ ।'

আমার বাগ হলো। বললুম—'কলকাতায় কোথাও একপাটি চটি বিক্রি হয় না ।'

সন্তা গম্ভীরভাবে বললো—'এখানে হয়। হাফ-পাটিও হয় ।'

আমি বুঝতে পারলুম, সন্তা ইয়ারকি মারছে। চটিটাকে খুঁজে বের কবার জন্যে আমি একটা ফন্দি বের করেছিলুম। বললুম—

'একটা কাজ করলে হয় না, সন্তা ?'

সন্তা আমার মুখের দিকে তাকালো।

'বাকি পাটিটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে এলে কেমন হয় ?'

'ভালো হয়। কেউ তুলে নিয়ে পালাবে।'

'সেইজন্যেই তো ফেলে দেব। কেউ তুললেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ধরে ফেলবো।'

'কখন নিয়ে পালাবে, তুই টেরই পাবি না।'

'আমরা তো লুকিয়ে থাকবো।'

'তাতে আবার একটা বিপদ হবে। দু'খানা চটি নিয়ে দুটো লোকের মধ্যে মারামারি বেধে যাবে। আমার একবার একটা দাঁতমাজার ব্রাশ হারিয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়ে দুটো লোকের, পাঁচখানা দাঁত ঝরে গিয়েছিল।'

'তাহলে চটিটার আশা ছেড়ে দেব ?'

'তা ছাড়বি কেন ? ছাখ্ না, কি হয়—'

আমরা গেট খুলে বেরিয়ে এলুম।

অনেকক্ষণ সন্তা আমার সঙ্গে কোন কথা বললো না। আমিও বললুম না। আমার মনে হচ্ছে, সন্তা আমার চটিটার কথা একটুও ভাবছে না।

রাস্তার মাঝখানে এক জায়গায় সে হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

'পরশুদিন রাত্তিরে যদি ঘোড়াটা সামনে এসে না পড়তো, তাহলে গুণ্ডা ছেলেটা আমাদের কিন্তু সহজে ছাড়তো না।'

বললুম—'সত্যি। ঘোড়াটা এসে না পড়লে সে হয়তো আমাদের কুঠি পর্যন্ত তাড়া করতো।'

সন্তা বললো—'শুধু কি কুঠি পর্যন্ত ? কুঠি পার করে দিয়ে আসতো হয়তো।'

'কিন্তু তুই ছেলেটাকে এত সন্দেহ করছিস কেন, বল্‌তো ?'

'কেন সন্দেহ করছি, পরে বুঝতে পারবি।'

'আচ্ছা, তুই সেদিন মন্দিরের পাশে গিয়ে কি দেখলি, বললি না তো?'

'দাঁড়া। সময় হলে সব বলবো।'

এইজন্যে সন্তাকে মাঝে মাঝে আমার ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে কিছু কথা গোপন রেখে সে একটু রেল্লা নিতে চায়। সে বুঝতে চায় না যে, আমি এখানে নতুন এসেছি। এখানকার হালচাল অনেক কিছুই জানি না। লোকজনদেব চিনি না। সেদিক থেকে ওর সুবিধে অনেক। সেইজন্যে সে আমাকে হুকুম করে, আর আমি তা মেনে চলি। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, ও আমি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বড় একটা মেশে না। একদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—'তোর বন্ধু বলতে এখানে কেউ নেই, সন্তা?'

সে বলেছিল—'থাকবে না কেন? ওরা কোন কাজের নয়। তোকে আমার খুব পছন্দ। তুই কেমন আমার সব কথা শুনিস।'

সন্তা বোধহয় সেইজন্যেই আমাকে বেশি পছন্দ করে।

আমিও কতকগুলো ব্যাপারে সন্তাকে খুব পছন্দ কবি। ও না থাকলে সাহেবকুঠিকে এমনভাবে জানা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। কলকাতায় ফিরে গেলে ওর কথা আমার খুব মনে পড়বে।

এসব ভাবতে ভাবতে সন্তার সঙ্গে আমি মন্দিরেব কাছে এসে পড়েছিলুম। মন্দিরের উঠোনে সীতাবাম সার্কাসের তাঁবু খাটানো রয়েছে। এখন তাঁবু একেবারে ফাঁকা। পাশের ছোট ছোট তাঁবুগুলোতে সার্কাসের লোকেরা বিশ্রাম করছে। বিকেলে ভিড় জমতে সুরু করবে। আবার রাত নটায় খেলা শেষ হলে ভিড়ও যাবে কমে।

কালকের খেলার কথা মনে করে আমার হাসি পেল। বললুম—'কাল ঘোড়াটা কেমন নাচ দেখালো, বলতো?'

সন্তা এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বললো—'ঘোড়ার মুখোশটা পেলে আমিও অমন নাচ দেখাতে পারি। ব্যাপারটা খুবই সোজা। মাথা গলিয়ে বাজনার তালে তালে শুধু নেচে যাও।'

সন্তা ঠিক আমার মনের কথাটাই বলেছে। কাল ঘোড়ার নাচ

দেখার পর থেকে আমারও খুব ইচ্ছে করছে, মুখোশটা পরে একটু নেচে দেখি, কেমন লাগে। সীতারাম যদি একবার ওটা পরে আমাদের নাচতে দেয়, তাহলে আমি কথা দিচ্ছি, আমার হারানো চটিটার আর খোঁজ করবো না।

মন্দিরের দালানে ভৈরব চক্রবর্তী বসে আছেন। ওঁর সামনে গাঁয়ের দু'জন লোক বসে কি সব কথাবার্তা বলছে, এখান থেকে শোনা যাচ্ছে না। সেই কথাবার্তার ফাঁকে ভৈরব চক্রবর্তী আমাদের ওপর বেশ নজর রাখছেন, বুঝতে পারছি। সন্তা তাই মন্দিরের দিকে যাবার কোন চেষ্টাই করলো না। সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছোট ছোট তাঁবুগুলোর ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো। একটা তাঁবুতে সবাই পড়ে ঘুমোচ্ছে। ওটার পেছনে কারা রান্না করছে, শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাশের তাঁবুতে সীতারাম বসে বসে ঝিমোচ্ছে। একটা ছেলে ওর পিঠ ড'লে দিচ্ছে। সব শেষের তাঁবুটা একেবারে ফাঁকা।

সন্তা টিনের একটা তোরঙ্গের দিকে আঙুল দেখালো। তোরঙ্গের ওপর ঘোড়ার মুখোশটা পড়ে আছে। কাঠের মুখ, চামড়ার পেট, লালচে লোমের ল্যাজ। সন্তা আমার দিকে তাকালো। আমিও সন্তার দিকে তাকালুম। সন্তার চোখদুটো চকচক করছিল। আমারও দুচোখ চকচক করছিল। সন্তা একটু হাসলো। আমিও একটু হাসলুম। তারপর দুজনে পা টিপে টিপে টিনের তোরঙ্গটার কাছে গেলুম। মুখোশটা ধরে একটু নাড়াচাড়া করলুম। সন্তা আবার আমার মুখের দিকে তাকালো। আমিও সন্তার মুখের দিকে। সে একটু হাসলো। আমিও একটু হাসলুম। তারপর মুখোশটা তুলে সন্তা আস্তে আস্তে ওর মাথাটা ঢোকালো। আমিও ওর দেখাদেখি পেছনের পায়ের কাছে আমার মাথাটা ঢুকিয়ে দিলুম। কিন্তু ভেতরটা দেখলুম, রাতের মতো অন্ধকার। ফিসফিস করে ডাকলুম—'সন্তা—'

'শ্‌শ্‌—'

'সন্তা, কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে রে—'

সন্তা বললো—'উল্‌টো দিকে ঢুকেছিস কেন? আমার দিকে ঘোর্।'

আমি ভুল করে ঘোড়ার পেছনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা ঢুকিয়েছিলুম। সন্তাব কথামতো মুখটা ঘুরিয়ে নিতেই আলো দেখতে পেলুম। সামনের দিকে অন্ধকার। শুধু নিচের দিকেই আলো। সন্তা বললো—'আমি সামনের দিকটা বেশ দেখতে পাচ্ছি। চোখ দুটোর কাছে দুটো বড় বড় গর্ত।'

বললুম—'বেশ বানিয়েছে, না রে? আয়, একটু নাচি।'

দুজনে আস্তে আস্তে নাচ্‌তে লাগলুম। ফাঁকা তাঁবু। আমরা নাচছি। আমাদের কেউ দেখছে না।

সন্তা বললো—'হাত দিয়ে ল্যাজটা নাচা। আমি মুখ নাচাচ্ছি।'

বললুম—'গলার কাছে বেশ আট্‌কে আছে। জোবে নাচলেও সহজে খুলবে না, কি বল্?'

'আমার গলার কাছেও বেশ আট্‌কে বসেছে।'

'তাহলে বাইরে চল। একটু ভালো করে নাচি।'

আমরা বাইরে এসে জোরে জোরে নাচতে লাগলুম।

হঠাৎ ঘুমন্ত তাঁবুর ভেতর থেকে ঘুম ভেঙে একটা বাচ্চা মেয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে চিৎকার করে উঠলো,—ওই দ্যাখো, ওখানে আমাদের ঘোড়া নাচতে নেগেছে—'

সন্তা ওর দিকে তেড়ে গেল। কাজেই, আমাকেও তেড়ে যেতে হলো। অমনি মেয়েটা তাঁবুর ভেতর ঢুকে গিয়ে একটা সোরগোল বাধিয়ে তুললো। সঙ্গে সঙ্গে সীতারাম এবং অন্যান্যদের গলা শোনা গেল। বিপদ বুঝতে পেরে সন্তা আর আমি দুজনে ছুটতে লাগলুম। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ে সন্তা আমাকে চেঁচিয়ে বললো—'শীগ্‌গির খুলে ফ্যাল্—'

খুলে ফেলার অনেক চেষ্টা করলুম, পারলুম না। তার ওপর সন্তা হিড়হিড় করে আমাকে সামনে টেনে নিয়ে চলেছে। কি করে পারি? বললুম—'গলায় আট্‌কে আছে। খুলতে পারছি না।'

সন্তা রেগে বললো—'আমিও খুলতে পারছি না রে—'

পেছনে তারই মধ্যে মেয়েটার চিৎকার শুনতে পেলুম—'এই ছাখো, আমাদের ঘোড়া পালাচ্ছে, আমাদের ঘোড়া—'

'ধর্, ধর্—'

একসঙ্গে অনেকগুলো গলা শুনতে পেলুম। ওরা আমাদের ধরবার জন্যে আমাদের পেছনে ছুটে আসছে। কত জন ছুটে আসছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। পাঁচ-ছ'জন হতে পারে, তার বেশিও হতে পারে। ওদের মধ্যে সীতারামও আছে মনে হয়। সীতারামের গলা সবার ওপরে।

গলা থেকে মুখোশগুলো খুলে ফেলতে পারলে আমাদের ছুটতে সুবিধে হতো। সন্তা বেশ ছুটতে পারে। সেদিন তার প্রমাণ পেয়েছি। আমিও খারাপ ছুটি না। একবার স্কুলের স্পোর্টসে একশো মিটার দৌড়ে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম। সন্তার সামনে ঘোড়ার চোখের কাছে দুটো বড় বড় ফুটো আছে। সে ওর ভেতর দিয়ে সামনের রাস্তা দেখতে পাচ্ছে। আমার সামনের দিকে তেমন কোন ফুটো নেই। আমার সামনে তাই অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই। নিচে ঘোড়ার পেটের দিকে একটু ফাঁক আছে। তার ভেতর দিয়ে আমি শুধু নিচের দিকের রাস্তাটুকু দেখতে পাচ্ছি। তাও একটুখানি মাত্র।

আমরা ছুটছি। সন্তা আমাকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছি না। শুধু আমার দু-পায়ের নিচ দিয়ে রাস্তাটা খুব জোরে ছুটে পালাচ্ছে। ওদিকে তাকাতে তাকাতে মাথা ঘুরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দুচোখ বন্ধ করে তাই আমি ছুটছি। মনে হচ্ছে, পড়ে যাবো। কিন্তু পড়ে গেলেই তো সর্বনাশ।

'ধর্, ধর্, ধর্—পালাচ্ছে—'

একসঙ্গে ওদের চিৎকার এগিয়ে আসছে। শুনে আমাদের পায়ের গতি আরো বেড়ে যাচ্ছে।

এবার রাস্তার এক পাশ থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠলো—'আরে ছাখো, ছাখো, সার্কাসের ঘোড়াটা পালাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দুদিক থেকে হই-হই করে অনেক লোকজন ছুটে আসছে। এরা সব গাঁয়ের লোক। কালকের সন্ধ্যেয় নাচ

দেখিয়ে ঘোড়াটা খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। আজ ওরা সেই ঘোড়াকে চোখের সামনে ছুটে যেতে দেখে জীবনটাকে হয়তো ধন্য মনে করছে। জল-তেষ্টায় তখন আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। অথচ দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেবো, সে উপায় নেই। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করেছে।

'সার্কাসের ঘোড়া পালাচ্ছে, ঐ ছাখো, সার্কাসের ঘোড়া—'

কেউ ভয়ে আমাদের পাশে আসছে না। আসল ঘোড়া নয় জেনেও সবাই, দেখছি, ভয় পাচ্ছে। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। বেশী উৎসাহী যারা, তারা আমাদের পেছনে একটা দূরত্ব রেখে ছুটছে।

সামনে কেউ বোধহয় আমাদের ধরবার জন্যে এগিয়ে এসেছিল। সন্তা ওকে দেখে পাগলের মতো লাফ দিয়ে তেড়ে গেল। তখন পেছন ফিরে লোকটা পড়ি-মরি করে একটা ডোবায় লাফিয়ে পড়ে আমাদের জন্যে পথ ছেড়ে দিল।

'ক্ষেপে গেছে, ক্ষেপে গেছে। সার্কাসের ঘোড়াটা ভীষণ ক্ষেপে গেছে। পালা—পালা—'

সন্তা লাফ দিয়েছিল, তাই রক্ষে। নইলে লোকটা আমাদের ধরেই ফেলতো। ধরে ফেললে তারপরে যে কি ঘটতো, সে তো সবার জানা।

রাস্তার দুপাশের চিৎকার চেঁচামেচি থেমে যেতেই বুঝতে পারলুম, আমরা গাঁয়ের বাইরে এসে পড়েছি। গলাটা ভিজিয়ে নেবার মতো মুখে একটুও থুতু নেই। ঘেমে নেয়ে উঠেছি একেবারে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এভাবে যদি আর দশ-পনেরো মিনিট ছুটি, তাহলে ঠিক মরে যাবো। বললুম—'সন্তা, আর কতদূর?'

'এসে গেছি। আর একটুখানি—'

গেট খোলাই ছিল। আমরা একইভাবে ছুটে সাহেবকুঠির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। কিন্তু এখানে আবার আর এক বিপদ। সার্কাসের ঘোড়াকে ছুটে আসতে দেখে রাজা কোথ্থেকে ঘাউ ঘাউ করে তেড়ে এলো।

আমার ইচ্ছে ছিল, এতখানি পথ যখন ছুটে এসেছি, বুলিকে ঘোড়ার নাচটা একটু দেখাবো। মা তো কাল যাননি, ঘোড়ার নাচও দেখেন নি। মা-ও যদি দেখেন, খুব মজা পাবেন। কিন্তু তার আগেই রাজা সব গুব্‌লেট করে দিল।

রাজাকে তেড়ে আসতে দেখে সন্তা ভয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো—'রাজা, আমি—আমি—'

রাজা কান পেতে সন্তার কথাগুলো শুনলো। কিন্তু তারপরই আবার ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বকাবকি করতে লাগলো। সন্তা ডাকলো—'রাজা—'

রাজা অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগলো। সে কি করবে. ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ততক্ষণে গাঁয়ের আর সার্কাসের লোকেরা গেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এবার তাকে কি করতে হবে. বুঝে উঠতে রাজার একটুও দেরি হলো না। সে ঘাউ ঘাউ শব্দ করতে করতে গেটের দিকে তেড়ে গেল। ততক্ষণে আমরা টেনে-হিঁচড়ে মুখোশটা খুলে ফেলেছি।

সন্তা রাস্তার ওপরে ঘোড়ার মুখোশটা ফেলে দিয়ে গেট বন্ধ করে চলে এলো। ওরও আমার মতো অবস্থা। ঘেমে নেয়ে একশা।

রাজা হঠাৎ ওর হাঁকডাক বন্ধ করে কেমন বোকার মতো আমাদের দিকে চেয়ে এগিয়ে এসে বেশ করে শুঁকে নিয়ে আমাদের গা চেটে দিতে লাগলো

সেদিন আমরা আর সার্কাস দেখতে পেলুম না। ওরা শাসিয়ে গিয়েছিল, ধরতে পারলে ওরা আমাদের আচ্ছা কষে সার্কাস দেখিয়ে ছাড়বে। কিন্তু সেজন্যে নয়। আমরা যাইনি অন্য কারণে। গলায়, বুকে আর পায়ে এত ব্যথা হয়েছিল যে, বিছানা ছেড়ে আমাদের উঠতেই ইচ্ছে করছিল না।

আমরা শুয়ে আছি। দোবের কাছে রাজা শুয়ে আছে। ঘুমের ভেতর সে গরগর করে উঠছে। আমাদের ঘুম ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে তার গরগরানিতে।

ডাকলুম—'সন্তা—'

সন্তা জেগে আছে। সাড়া দিল—'কি?'

'সার্কাসের ঘোড়াটা কি আজ সত্যি সত্যি ক্ষেপে গিয়েছিল?'

'মনে হয়, ক্ষেপেই গিয়েছিল।'

আমার ভেতরে একটা প্রচণ্ড হাসি ওই সার্কাসের ঘোড়ার মতো নেচে চলেছে। সন্তার ভেতরের খবর জানি না। সে একটু চুপ করে থেকে বললো—'না ক্ষেপে উপায় ছিল না।'

আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না। জোরে হেসে ফেললুম হাসির জন্যে রাজা গরগর শব্দ করে আমাকে ধমক দিল। আমি বালিশে মুখ চেপে একটু হেসে নিলুম। দূর থেকে সার্কাসের ব্যাণ্ডের শব্দ ভেসে আসছে। বোধহয়, আজকের খেলা আরম্ভ হলো। ব্যাণ্ডের শব্দ কিছুক্ষণ শুনে আমি বললুম—'সার্কাসের দলটা এসে সাহেবকুঠিকে খুব আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে, তাই না সন্তা?'

সন্তা গম্ভীরভাবে বললো—'আমার মনে হচ্ছে, সার্কাসের দলকে কেউ সাহেবকুঠিতে আনিয়েছে।'

'অ্যাঁ ?'

আমি চমকে উঠলুম।

'তোর কি তাই মনে হয় না ?'

'খেলা দেখিয়ে বেড়ানোই ওদের কাজ। ওদের কে-ই বা ডেকে আনবে ? কেনই-বা ডেকে আনবে ?'

সন্তা বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। বললো—'কি বললি ? কে ডেকে আনবে ? কেন, কেউ কি ওদের ডেকে আনতে পারে না ?'

'ডেকে আনার দরকার কি ? কিছু লাভ হবে এতে ?'

'হয়তো হবে। আমরা জানি না। কার কি দরকার, সব কি আমরা সব সময় জানতে পারি ?'

সন্তা কি ভাবছে, আমি বুঝতে পারলুম না। ওর কথা শুনে আমার মনে হলো, ও কোন গভীর এবং গোপন ব্যাপার নিয়ে ভীষণভাবে মাথা ঘামাচ্ছে। বললুম—'যে-ই ডেকে আনুক আর তার যে-কোন প্রয়োজনই ওতে থাক, গাঁয়ের লোকদের ওরা প্রচুর আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু—'

সন্তা কোন কথা না বলে পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করলো।

সকালে সন্তা আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে বললো—'বিল্লু, কাল রাত্তিরে মন্দিরের সব সোনা চুরি হয়ে গেছে।'

শুনেই হুড়মুড় করে বিছানার ওপর ওঠে বসলুম। তখনও আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে ছিল। সেই ঘুম-জড়ানো চোখে জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম। গাছগাছালির আড়াল কাটিয়ে রোদ্দুর তখন খুব পুরু হয়ে উঠোনের ওপর পড়ে আছে। মনে হচ্ছে, বেলা অনেক হয়ে গেছে। ঘুমের ঘোরে কি শুনেছি, বুঝতে পারিনি। সন্তাকে জিজ্ঞেস করলুম—'কি হয়েছে, সন্তা?'

সন্তা বললো—'কাল রাত্তিরে সার্কাসের খেলা শেষ হয়ে যাবার পর মন্দিরের সব সোনা চুরি হয়ে গেছে। মন্দিরের পেছনের দেয়ালে সিঁদ কেটে স্টীলের স্যুটকেস সুদ্ধু সমস্ত গয়না কারা চুরি করে নিয়ে

গেছে। সকালে ভৈরব চক্রবর্তী গাঁয়ের লোকজন সঙ্গে নিয়ে এসে বাবুসাহেবকে জানিয়ে গেল।'

'বাবা ওদের কি বললেন?'

'বাবুসাহেব ওদের থানায় ডায়েরি করতে বলেছেন।'

'ভৈরব চক্রবর্তী কি বলছে?'

'লোকটা আর বলবে কি? শুধু কাঁদছে—'

'ওই গুণ্ডা ছেলেদুটো এসেছিল?'

'না।'

সন্তা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—'এ রকম যে কিছু-একটা ঘটবে, আমি মনে মনে আঁচ করেছিলুম।'

'তবে আগে থেকে বলিস নি কেন?'

'আমার কথা কি তোরা বিশ্বাস করতিস?'

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলুম, এমন চুরি কার দ্বারা সম্ভব? মনে মনে আমি অপরাধীদের একটা লিস্ট তৈরি করে ফেললুম। সেই লিস্টের মধ্যে ভৈরব চক্রবর্তী, গুণ্ডা প্রকৃতির সেই দুই ছেলে এবং সীতারাম অবশ্যই ছিল।

সন্তা বললো—'উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা জলখাবার খেয়ে নে। তারপর চল্, পুলিশ আসবার আগে আমরা মন্দিরের পেছনে কোথায় সিঁদ কাটা হয়েছে, দেখে আসি।'

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। গলায়, বুকে, পায়ে ব্যথাটা তেমনি আছে। একটুও কমেনি। ওদিকে পুকুরের ধারে আমলকী গাছের ছায়ার নিচে বাবাকে খুব চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে দেখলুম।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মার ঘরে গেলুম জামাপ্যান্ট ছাড়তে। বাবা কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললো—'জানিস বিল্লু, মন্দিরের সব সোনা চুরি হয়ে গেছে—'

বললুম—'জানি, দেয়ালে সিঁদ কেটে চুরি হয়েছে।'

'তুই জানিস?'

'সেইজন্যে তো এখন আমরা যাবো।'

'কোথায় ?'

'চোরটাকে খুঁজে বের করতে হবে না ?'

'তোরা চোর খুঁজে বের করবি ?'

আমি মাথা নাড়লুম। বুলি হাসলো। হাসতে লাগলো।

'হাসছিস যে তুই ?'

'না, হাসবো না।'

বুলি হাসি চাপবার চেষ্টা করছে, আমি বুঝতে পারলুম। বললুম —'আমাকে চা আর জলখাবার দিতে বল্। সময় হাতে বেশি নেই।'

বুলি মার কাছ থেকে চিড়ের পায়েস নিয়ে এলো। তারপর চা আনতে ছুটে গেল।

চিড়ের পায়েস আমার খুব প্রিয় খাবার। কলকাতায় কতবার বায়না ধরে মার কাছ থেকে চিড়ের পায়েস আদায় করে খেয়েছি। কলকাতায় খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না. পায়েসটা এত জমে না। এখানে দুধ খুব খাঁটি — নিজেদের গোরু। পায়েসটাও তেমনি জমেছে খুব। কয়েক চামচে প্লেটটা খালি করে আমি বুলিকে আবার পাঠালুম প্লেটটা ভরে আনবার জন্যে। বুলি এবার আধপ্লেট পায়েস নিয়ে এলো। পায়েস খেতে খেতে আমি বুলিকে কাছে ডাকলুম। ফিসফিস করে বললুম — 'বুলি, আজ বাবার রিভলভারটা একবার খুঁজে এনে দিতে পারবি ?'

বুলি ওর ড্যাবড্যাবে চোখে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলো।

'সত্যি, তোরা চোর ধরতে যাবি ?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম — 'তুই কি ভাবিস্, বল্ তো ?'

বুলি গম্ভীর হয়ে গেল। ও গম্ভীর হলে ওকে আরো বোকা-বোকা দেখায়। বললুম — 'ছাখ্ না রিভলভারটা —'

'শ্ শ্ শ্ — কাউকে বলবি না তো ?'

বুলি গোয়েন্দাগিরির কিছুই বোঝে না। গোয়েন্দার বোন হবার ওর কোন যোগ্যতাই নেই। আমি কটমট করে তাকাতেই সে রিভলভারের বুলেটের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি চায়ের কাপটা

শেষ করেছি। বুলি খালিহাতে ফিরে এলো।

'বাবা বেরিয়ে যাক্। তারপর এনে দেবো, এ্যাঁ?'

বুলি তারপর আর এক প্লেট পায়েস এনে দিয়ে বললো—'এটা কিন্তু সন্তাদার—'

আমি সন্তাকে ডাকলুম। সন্তা অনেক দেরিতে এলো। বললুম—'সুখবর আছে। আজ বাবার রিভলভারটা পাওয়া যাবে।'

সন্তা প্লেটটা হাতে নিয়ে বললো—'আমি তোকে ওটার কথাই বলতে আসছিলুম।'

'তুই বলবি কি? আমি জানি না, আজ ওটার কত দরকার?'

ঠিক তখনই রাস্তায় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। বোধহয়, সাহেবকুঠির জিপটা আসছে। কিন্তু ভুল ভাঙলো একটু পরেই। বাবা খুব ব্যস্তভাবে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাবার ব্যস্ততা দেখে আমরাও বেরিয়ে এলুম। দেখলুম, আমাদের কুঠির জিপ নয়, পুলিশের গাড়ি।

গেটের সামনে গাড়ি রেখে কয়েকজন পুলিশ নেমে এলো। সামনে মোটাসোটা একজন অফিসার। সন্তা বললো—'ওটা থানার ও. সি.।'

বাবা ওদের বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন। মংলুকে ডেকে ওঁদের জন্যে চা নিয়ে আসতে বললেন।

অফিসারটি বললেন—'চায়ের দরকার নেই মিঃ সরকার। আমরা আপনার কাছে এসেছি।'

'কেন বলুন তো?'

'মন্দিরে কাল রাত্তিরে সোনার গয়না সব চুরি হয়ে গেছে, আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, সকালে ওঁরা এসে আমাকে বলে গেছেন।'

'কত সোনা?'

'ঠিক জানি না।'

'আপনার কাছে সোনা থাকতো, অথচ আপনি জানেন না, কত সোনা?'

'কখনো ওজন করে দেখিনি। তবে কি কি গয়না, আমি জানি।'

'আপনার কাছে লিস্ট আছে?'

'আছে।'

'আচ্ছা, আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

'কাকে সন্দেহ করবো, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

অফিসারটি বাবার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা, আপনি একটু আগে বললেন, সকালে ওঁরা এসে আপনাকে গয়না চুরির কথা বলে গেছেন। তার আগে আপনি জানতেন না?'

বাবার মুখের রংটা হঠাৎ পাল্টে গেল। বললেন—'আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না!'

অফিসারটি হাসলেন। বললেন—'আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'কিছু জিজ্ঞাসাবাদ আছে।'

'এখানে তা হয় না?'

'না। ওরা আপনাকে সাস্‌পেক্ট করেছে। কাজেই—'

বাবা যেন কেঁপে উঠলেন একবার।

'আমাকে? আমাকে ওরা সাস্‌পেক্ট করেছে?'

'চলুন, গাড়িতে উঠুন। আর হ্যাঁ, গয়নার লিস্টটা সঙ্গে নেবেন। আর একটা রিভলভার আপনার কাছে আছে। ওটাও সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

বাবা মংলুকে দিয়ে অবন্তীবাবুকে ডাকতে পাঠালেন। অবন্তীবাবুকে গয়নার লিস্টটা আনতে বলে উনি নিজে ঘরের ভেতর থেকে রিভলভারটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মা আর বুলি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ওদের মুখে কোন কথা ছিল না। অবন্তীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাবা পুলিশের গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটা চলে যেতেই মা কিছু বুঝতে না পেরে হু হু করে কেঁদে ফেললেন।

সন্তা একটা কৌটোর ঢাকনা ফুটো করতে করতে বললো—'আমি এর বদলা নেবো। সবার সামনে বাবুসাহেবের অপমান—'

সন্তা যে বাবাকে এত ভালোবাসে, আমি জানতুম না। আমার বুকের ভেতরটা টলটল করে উঠলো। আমার ইচ্ছে করছিল, সন্তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। আমি ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার দুচোখ জলে ভরে আসছিল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমি চোখ দুটো মুছে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম।

রাজাও আমাদের সঙ্গে ঘুরঘুর করছে। সেও যেন কিছু করতে চায়। ওর ছটফটানি আজ চোখে পড়ার মতো।

সন্তা কৌটোর ভেতর ওর সাপটাকে পুরে ঢাকনা বন্ধ করলো। তারপর একটা ঝোলায় পুরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বললো—'চল্—'

আমি কিছু না বলে ওর সঙ্গে চলতে লাগলুম। রাজাও সঙ্গে চললো। কুঠির কেউ জানলো না, আমরা কোথায় যাচ্ছি। রাস্তায় যেতে যেতে সন্তা বললো—'কারসাজিটা করেছে ভালো। বাবুসাহেবকে জড়িয়ে পুলিশের নজর এদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সেই ফাঁকে ওরা ওদিক দিয়ে সোনা নিয়ে কেটে পড়বে।'

একটু থেমে সে বললো—'ও দিকটা আগে আমাদের আটকে ফেলতে হবে। কি বল্?'

বললুম—'তুই যা বলবি, করবো। আমার মাথায় কিছু আসছে না।'

সে আমার কাঁধে হাত রাখলো বললো—'যাই ঘটুক, কখনো নার্ভাস হবি না। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে, বুঝলি? এদের কারসাজিটা অনেক দিনের খুব ঠাণ্ডা মাথায় ফন্দি করে এরা বহুদিন থেকে কাজ শুরু করেছে। কেউ ধরতে পারেনি। শনিবারের মাঝরাত্তিরে যে শব্দটা হতো, সেটা কোথায় হতো, জানিস?'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—'কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি—'

মন্দিরের সামনের মাঠে সার্কাসের তাঁবু যেমন খাটানো ছিল,

তেমনি আছে। খড়কুটো ধুলো শুকনো ঘাস মাঠ জুড়ে পড়ে আছে। পাশের ছোট তাঁবুগুলোতে লোকজন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেউ বসে আছে, কেউ শুয়ে আছে। সবারই চোখে-মুখে কি হয়, কি হয়—একটা থমথমে ভাব।

সন্তা আমার হাত ধরে টানতে টানতে মন্দিরের পেছনে নিয়ে গেল। মন্দিরের পেছনের দেয়ালে বড় একটা গর্ত। ভাঙা ইঁটের টুক্‌রো দুদিকে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। রাজা সামনের দুপায়ে ইঁটের কুচো সরিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। আমরা ওকে টেনে বের করে আনলাম।

সন্তা বললো—'শনিবার মাঝরাত্তিরে এখানেই দেয়াল ফুটো করার শব্দ হতো। সবাই মনে করতো, ওটা কোন দেবতা বা ভূতের কারসাজি। ওটা যে আসলে মানুষেরই কারসাজি, তা আমিই শুধু জানতুম। ভৈরব চক্রবর্তী কাউকে এদিকে আসতে দিত না। সেদিন লুকিয়ে এদিকে এসে আমি বুঝতে পেরেছিলুম, কিছু একটা ঘটবে, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সেদিন তোকে আমি ওকথা বলিনি?'

আমি মনে করবার চেষ্টা করলুম। হ্যাঁ, সন্তা ও ধরনের কিছু একটা বলেছিল, মনে পড়ছে।

সন্তা বলতে লাগলো—'একটু একটু করে ভেঙে কাল রাত্তিরে বাকিটা ওরা কারসাজি করে বেশ নিখুঁত ভাবে সরিয়ে ফেলতে পেরেছে!'

আমি সব দেখেশুনে বললুম—'ওরা আগে থেকে পুলিশ রাখলে পারতো। এতখানি যখন সোনা, তখন আগে থেকে পুলিশ বসানো কি উচিত ছিল না?'

তুই বুঝতে পারছিস না। বাবুসাহেবও তো কাল ওকথাই বলেছিলেন, শুনিস নি? কিন্তু আগে থেকে পুলিশ বসালে যে ওদের প্ল্যান্‌টাই মাটি হয়ে যেত।'

রাজা আবার গর্তের ভাঙা ইঁটের টুকরোগুলো আঁচড়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। সন্তা ওকে টেনে সরিয়ে আনলো।

'ও ওরকম করছে কেন রে? ভেতরে কেউ আছে নাকি?'

সন্তা আমার মুখের দিকে তাকালো। খপ করে কাঁধের ঝোলাটা আমার হাতে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সে গর্তের ভেতরে মাথাটা সেঁধিয়ে দিল। রাজা সন্তার মাথাটা খুঁজে না পেয়ে ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে বার-দুই গরগর শব্দ করলো। তারপর ওর একটা পা কামড়ে বাইরে টানতে লাগলো। সন্তা বেরিয়ে এলো। হাঁটু আর কনুইব ধুলো ঝেড়ে বললো—'নাহ্, কেউ নেই। এখন কি কেউ থাকে?'

পকেটেব রুমাল বের করে সে কপালের ঘাম মুছলো। কি ভাবলো একটু। বললো—'কাল অনেক রাত্তিরে সার্কাস শেষ হয়েছে। তাহলে চুরিটা হয়েছে শেষ রাত্তিরে। যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে সোনার স্যুটকেসটা এখনো হয়তো গাঁয়ের মধ্যেই আছে। চল্, এখানে আর সময় নষ্ট না করে অন্যখানে খুঁজি। এখনো চেষ্টা করলে হয়তো তাকে ধরেও ফেলতে পারি।'

৯ অপরাধীর খোঁজে

জমিদারবাড়ির সিংদরোজার সামনে মুণ্ডুহীন সিংহ দুটোর নিচে দাঁড়িয়ে আমাদের ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে কিনা ভাবছিলুম। সন্তার কাছে এ বাড়ির ভেতরের যে বর্ণনা শুনেছি, তাতে ভেতরে যাবার ভাবনায় বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে। ভেতর থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ উঠে আসছে। উঁকি মেরে তাকালুম, কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু পায়রাগুলো বকম বকম করে চলেছে। তার প্রতিধ্বনিগুলো বুকের ভেতরে এসে আরো ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে।

সন্তা জিজ্ঞেস করলো—'কি ভাবছিস?'

বললুম—'কিছু না।'

'ভয় পাচ্ছিস?'

বললুম—'না।'

সন্তা খপ করে আমার গলাটা চেপে ধরলো—'লজ্জা করে না? বাবুসাহেবকে ওরা সবার সামনে অপমান করে ধরে নিয়ে গেছে, তুই না কলকাতার ছেলে? বাবুসাহেব না তোর—'

সন্তা হয়তো আরো অনেক কিছুই বলতো, কিন্তু তার আগেই রাজা জমিদারবাড়ির ভেতর থেকে কিসের যেন গন্ধ পেয়ে ঘাউ ঘাউ করে ডাকতে ডাকতে সেইদিকে ছুটে গেল।

আমরা চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলুম—'রাজা, রাজা—'

'ঘাউ ঘাউ—'

'রাজা, রাজা—'

'ঘাউ ঘাউ, ঘাউ ঘাউ—'

ক্রমশ রাজার ডাক অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। ছুটে ভেতরে ঢুকে গেলুম। সামনে

একটা উঠোন, একপাশে পূজোর দালান। পায়রা আর চামচিকেরা পায়খানা করে পূজোর দালানটা ভরিয়ে রেখেছে। দুদিকে দুটো বড় বড় দরজা। দরজাগুলোর মাথায় ইঁট আর বালি ঝরে গেছে। আমি সন্তাকে বললুম—'এবার থেকে আমরা দুজনে কিন্তু একসঙ্গে থাকবো, বুঝলি?'

সন্তা আমার হাত ধরে বাঁদিকের দরজা দিয়ে ঢুকলো। একটা উঁচু দালান দুদিকে পর পর অনেকগুলো ঘর। সব অন্ধকার। দালান ধরে কিছুদূর যাবার পর অন্ধকারের মধ্যে আমরা একেবারে ডুবে গেলুম। সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সন্তা বললো—'একটা ভুল হয়ে গেছে। বাবার টর্চটা আনবো বলে বের করেছিলুম। আনতে ভুলে গেছি—'

বললুম—'ইস্! টর্চটা থাকলে এখন খুব কাজে লাগতো। তখন যদি জানতুম, ভেতরটা এত অন্ধকার—'

এবার আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাজার ডাক শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটা চামচিকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তার ডানার শব্দটা ডান দিকে বেঁকে গেল, মনে হলো। সন্তা আমার হাত ধরে আছে। আমি সন্তার হাতটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরে রইলুম। এবার আমরা চামচিকের ডানার শব্দ ধরে ডানদিকে বাঁক নিলুম। ভয়ে গা ছমছম করছে। এমন সময় রাজার ডাক শুনতে পেলুম।

সন্তা বললো—'ঠিক পথেই এসেছি। কোন ভুল হয় নি।'

গলা শুকিয়ে গিয়েছিল আমার। ফিসফিস করে বললুম—'তুই আগে ভেতরে আসিস নি কোনদিন?'

'এসেছিলুম। কিন্তু সেবার আমি গিয়েছিলুম ডানদিকটায়। এদিকে কখনো আসি নি।'

'রাজা কোথায় ডাকছে?'

'বুঝতে পারছি না।'

'সন্তা, আমার হাতটা শক্ত করে ধরে রাখিস্।'

'ঠিক আছে। চল্, দেয়াল ধরে এগোই—'

আমি সন্তার হাত শক্ত করে ধরেছিলুম। তবু ভরসা পাচ্ছিলুম না। অন্ধকারে মনে হচ্ছিল, সন্তা নেই, কোন্ অন্ধকার পাতালপুরীতে আমি একা বুঝি হারিয়ে গেছি। একটুও হাওয়া নেই। পচা ভ্যাপসা গন্ধে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবু আমরা দেয়াল খামচাতে খামচাতে এগোচ্ছি। কিছুদূর এগিয়ে বুঝতে পারলুম, দালানটা আবার বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে।

বাঁদিকে ঘুরতেই আমরা রাজার ডাক স্পষ্ট শুনতে পেলুম। মনে হচ্ছে, রাজা বেশ কাছেই কাউকে দেখে ডাকছে। আমরা এবার খুব তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলুম। কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ মনে হলো, সামনে পথ বন্ধ। আমরা অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক দেয়াল হাতড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। রাজার ডাক শুনতে পাচ্ছি—অনেকটা স্পষ্ট এখন ওর ডাক। মনে হচ্ছে, আমরা ওর কাছেই এসে পড়েছি। কিন্তু ওর কাছে যেতে পারছি না। হয়তো রাজা কাউকে দেখতে পেয়েছে। সে যেভাবে ডাকছে, তাতে মনে হয়, কাউকে সে খুব কাছে থেকে পাহারা দিচ্ছে। আমরা সামনের অন্ধকার আড়ালটুকু পার হতে পারলেই রাজার কাছে পৌঁছে যাবো। এখন মনে হচ্ছে, রাজার কাছে পৌঁছতে পারলেই আমরা সোনা চুরির রহস্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারবো।

আমরা এবার ডানদিকে এগোতে লাগলুম। আমি জিজ্ঞেস করলুম—'এত অন্ধকার কেন বলতো, সন্তা?'

সন্তা দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে বললো—'দেখছিস না চারদিকের দরজা জানলা সব বন্ধ। তাছাড়া, মনে হয় এদিকটায় চাকর-বাকরেরা থাকতো। ডানদিকটা কিন্তু এত অন্ধকার নয়।'

আমাদের হাতে একটা দরজা ঠেকলো। দরজাটা খোলা। আমরা তার ভেতর দিয়ে একটা ঘরের ভেতর ঢুকে গেলুম। ঘরের ভেতরেও সমান অন্ধকার। দেয়াল ধরে এগোতে এগোতে আমরা আবার একটা দরজার সামনে এসে পড়লুম। দরজাটা বন্ধ। শুধু

শেকল দেওয়া। আমি এখন আমার ঘাড়ের কাছে একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, পুরনো বাড়িটা যেন বহুদিন পরে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে বসেছে। তার নিঃশ্বাস আমার ঘাড়ে এসে লাগছে। গা-টা হঠাৎ শিউরে উঠলো।

সন্তা জিজ্ঞেস করলো—'দরজা খুলবো?'

সে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই শেকল টেনে দরজাটা হাট করে খুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে একরাশ আলো এসে ঘরের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সামনে একটা ছোট্ট উঠোন। ওখানে একটা বাদামী রঙের ঘোড়ার কালো ল্যাজ আর পেছনের দুখানা পা দেখতে পাচ্ছি। রাজাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওর ডাক শুনতে পাচ্ছি। গলা ছেড়ে ডাকলুম—'রাজা—'

ঠিক তখনই পেছন দিক থেকে কে আমাদের দুজনের ঘাড় খামচে ধরে হা হা করে হেসে উঠলো। তার হাতের আঙুলগুলো যেন লোহা দিয়ে তৈরী। আমরা ভয় পেয়ে গেলুম। আমাদের নড়বার শক্তি ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে যে একটু দেখবো, সে উপায়ও নেই। হাত দুখানার শক্তি যে অসামান্য, আঙুলগুলোর চাপেই বুঝতে পারছিলুম। আর একটু জোরে যদি চাপ দেয়, তাহলে হয়তো আমাদের দম বন্ধ হয়ে যাবে। সামনে ঘোড়ার কালো ল্যাজ আর বাদামী দুখানা পা—আপাতত এই দেখছি।

ভেবেছিলুম, রাজা ছুটে আসবে। শক্ত হাতদুটোর মালিকের দিকে তেড়ে যাবে। তাহলে আমরা এ যাত্রায় বেঁচে যাবো। কিন্তু রাজা তা করলো না। ভাবলুম, এখানেই আমাদের মরতে হবে। আমরা এখানে কিভাবে মরলাম, কার হাতে মরলাম—কেউ জানতেও পারবে না। হয়তো সোনা চুরিরও কোন হিল্লে হবে না। বাবাকে ওরা জেলে দেবে। মা আমার জন্যে আর বাবার জন্যে কেঁদে কেঁদে মারা যাবেন। তখন বুলির কি হবে? বুলিকে হয়তো কোন ছেলেধরার দল ধরে নিয়ে যাবে। আমি এতকথা একসঙ্গে পর পর ভেবে নিলুম। হঠাৎ দেখলুম, সন্তা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে

ছিট্‌কে লাফ মেরে ঘুরে দাঁড়ালো। লোকটা ওকে আবার ধরবার জন্যে এগোতে যাচ্ছিল।

সন্তা লোকটার মুখ দেখে চেঁচিয়ে উঠলো—'একি, সনাতনদা? তুমি?'

'তুই এখানে কেন?'

'তার আগে বলো, তুমি এখানে কেন?'

'আমি এখানে কেন, তাতে তোর দরকার কি?'

লোকটার সমস্ত আক্রোশ তখন আমার ঘাড়ের ওপরে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এরপর আমি হয়তো ঘাড় গুঁজে মাটিতে পড়ে যাবো।

সন্তা বললো—'ওকে ছেড়ে দাও। ওর কষ্ট হচ্ছে—'

লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললো—'কষ্ট হচ্ছে? এখানে এসেছিলি কেন?'

লোকটা এবার দুহাতে আমার ঘাড় আর গলা ধরে আমাকে শূন্যে তুলে ফেললো।

'যেমন আমার পেছনে লাগতে এসেছিস, তেমনি তোদের এক-একটাকে এমান করে শেষ করে ফেলবো।'

আমি বুঝতে পারছিলুম, আমার মৃত্যু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আর শ্বাস নেবার শক্তিও আমার নেই। আমার সামনে সন্তার নিরুপায় মুখ। কিন্তু সন্তা এখনো তার কালনাগিনীকে বের করছে না কেন? সন্তা কি ওর কালনাগিনীর কথা ভুলে গেছে?

'বিশ্বাস করো, সনাতনদা, আমরা তোমার পেছনে লাগতে আসিনি। ও কলকাতা থেকে নতুন এসেছে। জমিদারবাড়ির ভেতরটা দেখতে চেয়েছিল। তাই ভেতরে এসেছি। তোমার পেছনে লাগতে আসবো কেন? ওকে ছেড়ে দাও।'

'সত্যিকথা বলছিস?'

'বিশ্বাস করো, সনাতনদা—'

লোকটা আমাকে আস্তে মাটিতে নামিয়ে দিল। আমি সন্তার

'এই চেহারা কোথায় যেন দেখেছি –'

পাশে গিয়ে লোকটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালুম। লম্বা ফর্সা চেহারা, মুখভর্তি দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল, ডানহাতে লোহার বালা, গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, পরনে নীল ফুলপ্যাণ্ট। এই চেহারা কোথায় যেন দেখেছি, মনে হচ্ছে। একটু ভাববার চেষ্টা করতেই মনে পড়লো, ইতিহাসের পাতায় এই রকম চেহারা দেখেছি—ঠিক যেন আর্যদের মতো—ফর্সা, টিকোলো নাক, টানা চোখ। ভৈরব চক্রবর্তীর চেহারার সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিল আছে লোকটার।

সন্তা বলেছিল, ভৈরব চক্রবর্তীর ছেলে ওর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে সাহেবকুঠি গাঁ থেকে কবে নাকি কোথায় চলে গেছে। এ কি তাহলে সেই ভৈরব চক্রবর্তীর ছেলে?

সন্তা ইতিমধ্যে লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিয়ে তুলেছে। বললো —'সেই-যে তুমি ওবছর গাঁ থেকে চলে গিয়েছিলে, তারপর এই প্রথম এলে। তাই না সনাতনদা?'

লোকটা সন্তার কথায় কান না দিয়ে বললো—'তোরা এসে ভালোই করেছিস। একা-একা আমার এখানে বিচ্ছিরি লাগছিল। সময় যেন কাটছিলই না। তবু তোদের সঙ্গে কথা বলে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কি বল্?'

'তবে যে তুমি আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলে?'

'মেরে ফেলিনি তো—'

লোকটা হ্যা হ্যা করে হাসলো। বললো—'চল্, বাইরে গিয়ে বসি। এখানে বড্ড গরম। বাইরে তবু একটু হাওয়া আছে।'

আমরা আগে-আগে ওদিকের উঠোনে নেমে গেলাম। লোকটা আমাদের পেছনে পেছনে এলো। এখন ঘোড়ার পুরো চেহারাটাই দেখতে পেলুম। বাদামীরঙের বিরাট চেহারার ঘোড়া। মুখে একটা থলে বাঁধা। থলেতে বোধহয় ছোলা আছে। ঘোড়া ছোলা খেতে ভালোবাসে।

রাজা কাছে কোথাও ডাকছে। ওকে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা এদিক-ওদিক ওকে খুঁজছি। হঠাৎ আমাদের পাশের ঘরের একটা

দরজা নড়ে উঠলো। আমরা বুঝতে পারলুম, ওটা ছিল রাজার পায়ের নখের আঁচড়। সন্তা ডাকলো—'রাজা, ওখানে তুই কি করছিস?'

'ঘাউ ঘাউ ঘাউ—'

রাজা সাড়া দিল। সে যে বন্দী, বোধহয় সেই কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করছিল।

লোকটা জিজ্ঞেস করলো—'কুকুরটা কি তোদের? ওরেব্বাস্, আর একটু হলেই আমাকে ছিঁড়ে ফেলতো।'

'ওকে ওভাবে আট্‌কিয়ে রেখেছো কেন, সনাতনদা?'

'আটকিয়ে না রাখলে ওটা এতক্ষণে আমাকে ঠিক খেয়ে ফেলতো। যেভাবে তেড়ে এসেছিল—'

রাজার জন্যে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল। ওকে ওভাবে আট্‌কিয়ে রেখে কথা বলতে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল আমাদের।

সন্তা বললো—'ওকে ছেড়ে দাও, সনাতনদা। আমরা তো আছি ও কিছু বলবে না।'

'না, রাত্তিরের আগে ওকে ছাড়তে পারবো না। ও তো ঘরের ভেতর দিব্যি আছে। কোন কষ্টই হচ্ছে না। কুকুর আবার এর চেয়ে ভালো কি থাকবে?'

'ও বাইরে আসতে চাইছে। দেখছো না, কেমন ডাকছে—'

'ডাকুক। চল্, আমরা ওখানটায় বসি।'

একটা কাঠগোলাপের গাছ। নিচে শান-বাঁধানো লাল রঙের রক। ওটা রোদ্দুরে ফেটে হাঁ করে আছে। লোকটা ওখানে গিয়ে বসলো। আমরাও ওর সামনে ভয়ে ভয়ে বসলুম। বাইরে হলে নির্ভয়ে লোকটার সঙ্গে বসে গল্প জমানো যেত। কিন্তু এখন এখানে লোকটার সঙ্গে কথা বলতেও আমাদের কেমন ভয় করছে।

সন্তা জিজ্ঞেস করলো—'ঘোড়াটা তোমার, সনাতনদা?'

'হুঁ—'

'তুমি খুব ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারো—'

লোকটা সন্তার চোখের দিকে খুব সন্দেহের চোখে তাকালো।

'তুই জানলি কি করে?'

সন্তা হাসলো।

'আমি জানবো কি করে? আমি তো তোমাকে জিজ্ঞেস করছি?'

সন্তা হাসতে লাগলো। সনাতন কপাল কুঁচকালো।

'কি করে জানলি, বল্?'

সন্তা ওর কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললো—'তুমি আমাকে ঘোড়ায় চড়াটা শিখিয়ে দেবে, সনাতনদা? আমার ঘোড়ায় চড়ার খুব ইচ্ছে।'

'দেবো। এখন গাঁয়ের খবর বল্।'

'গাঁয়ের খবর আর কি আছে, সনাতনদা? যেমন ছিল, তেমনি আছে। তোমার বাবা মন্দিরে পূজো করেন, সাহেবকুঠিতে আসেন, যান। এখন মন্দিরে সার্কাস হচ্ছে। সীতারামের সার্কাস। ওদের একটা ঘোড়া আছে, চমৎকার নাচতে পারে—'

আমি বললুম—'মাঝে মাঝে আবার ক্ষেপে যায়।'

লোকটা এবার আমায় দিকে তাকালো।

'এটা কে রে, সন্তা? আগে তো দেখিনি—'

'দেখবে কি করে? ও হচ্ছে সাহেবকুঠির বাবুসাহেবের ছেলে। কলকাতা থেকে কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।'

লোকটা যেন নিমপাতা চিবিয়ে ফেলেছে, এমনি মুখের ভঙ্গি করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

সন্তা বললো—'আর একটা খবর আছে, সনাতনদা। শুনেছ নাকি?'

'কি?'

'মন্দিরের সব সোনা কাল রাত্তিরে চুরি হয়ে গেছে। যত গয়না ছিল, সব।'

'তাই নাকি রে? কে নিয়েছে বল্তো?'

'কি করে জানবো বলো, সনাতনদা। সকালে পুলিশ এসে বাবু-সাহেবকে তো থানায় নিয়ে গেছে—'

'নিয়ে গেছে ? আমারও কিন্তু লোকটাকে সন্দেহ হয়।'

আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। আমি বললুম—'চল্ সন্তা, বাড়ি যাই—'

সন্তা লোকটার মুখের দিকে তাকালো। বললো—'তাহলে আমরা আসি সনাতনদা—'

লোকটা এবার আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো। বললো—'চল. তোদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

আমরাও উঠে দাঁড়ালুম। সন্তা বললো—'আমাদের কুকুরটাকে এবার ছেড়ে দাও, সনাতনদা।'

'ওকে তো এখন ছাড়তে পারবো না। ওকে কাল সকালে এসে নিয়ে যাস্।'

'সে কি ? ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, সঙ্গে নিয়ে যাবো না ?'

'সঙ্গে নিয়ে যেতে যদি হয়, তাহলে তোদেরও আজ এখানে থেকে যেতে হবে।'

'কেন ?'

'একটু অসুবিধে আছে।'

সন্তা হাসলো।

'বুঝেছি, তুমি ভয় পাচ্ছ। ঠিক আছে। তুমি একটা ঘরে ঢুকে পড়ো, দরজা বন্ধ করে দাও। আমরা ওকে নিয়ে চলে গেলে তুমি বেরিয়ে পড়ো—'

'ব্যস্—'

বলে লোকটা সন্তার গালে ঠাঁই করে একটা চড় কষে দিল।

'এখন কোনকথা না বলে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ি চলে যা—'

কয়েক পা গিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো। বললো—'না রে, তোদেরও যাওয়া চলবে না। আজকের রাত্তিরটা তোদেরও এখানে কাটিয়ে যেতে হবে।'

আমরা ওকথা শুনে চমকে গেলুম। দিনের বেলাতেই এই,

রাত্তিরে এ বাড়ির চেহারা না জানি কি রকম! আমি সন্তার মুখের দিকে তাকালুম। ওর গালে লোকটার আঙুলের ছাপ এখন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো—'কেন?'

'কেন? আমার ইচ্ছে—'

আবার আগের মতো আমাদের ঘাড় খামচে ধরার জন্যে লোকটার হাত দুটো কাঁকড়ার মতো এগিয়ে আসছে। তাই দেখে আমরা পড়ি-মরি করে ছুটতে লাগলুম। ছুটে আমরা বেশিদূর পালাতে পারলুম না। লোকটা ছুটে এসে আমাদের প্রায় ধরে ফেলেছিল আর কি! সন্তা লাফিয়ে উঠে এক ঝট্‌কায় ডানদিকের একটা দরজার শেকল খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। আমিও ওর দেখাদেখি ওঘরে ঢুকে পড়তেই সন্তা দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে খিলটা আটকে দিল।

লোকটা বাইরে থেকে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। আমরা প্রাণপণে দরজা ঠেলে রাখলুম। লোকটা তখন প্রচণ্ড রেগে দরজায় জোরে জোরে লাথি মারতে লাগলো। ওর লাথির চোটে মনে হচ্ছিল, দরজার খিলটা এখুনি বুঝি ভেঙে যাবে। কিন্তু দেখলুম, কিছুক্ষণ পরে লোকটা বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠলো—'এইবার?'

আমরা তখন দরজায় পিঠ দিয়ে বসে পড়লুম। ঘরের ভেতরে অন্ধকার। শুধু ওপরের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে একটা লুচির মতো একটুখানি রোদ্দুর মেঝের ওপর এসে পড়েছে। রোদ্দুরটা হেলে পড়েছে দেখে বুঝতে পারলুম, বিকেল হতে বেশি দেরি নেই। এখন ক্ষিদে পাচ্ছে। সকালে সেই একটু চিড়ের পায়েস খেয়েছিলুম, কখন হজম হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এখন তেষ্টা পাচ্ছে খুব। খাবার না হোক, এখন একগ্লাস ঠাণ্ডা জল যদি পেতুম! বললুম—'সন্তা, এখন কি করবি?'

'কি আর করা যাবে। রাতটা এখানে তাহলে কাটাতেই হবে।'

সন্তার কথা শুনে মনে হলো, সে বড়ো হতাশ হয়ে পড়েছে।

আমি ওকে একটু চাঙা করবার জন্যে বললুম—'সোনা চুরির ব্যাপারে তাহলে আর কিছু করা যাবে না—'

সন্তা আপশোস করলো—'লোকটাকে হাতের কাছে পেয়েও কিছু করতে পারলুম না।'

'তোর কি মনে হয়, এই লোকটাই সোনা চুরি করেছে?'

'ও বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'লোকটা তো ভৈরব চক্রবর্তীর ছেলে, না?'

'হুঁ—বছর-দুই আগে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি, সব সাজানো।'

'এই লোকটাই মাঝে-মাঝে অন্ধকার রাত্তিরে সাহেবকুঠির রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে আসতো?'

'তাই বুঝি? এই লোকটা?'

'হুঁ। এই ঘোড়ায় চড়েই ও আসতো—'

'তাহলে বুঝে ছাখ্, শনিবার মাঝরাত্তিরের এই ভুতুড়ে লোহা-পেটানোর আওয়াজ আর মাঝে-মাঝে অন্ধকারে সাহেবকুঠির রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে আসার ঘটনা—এ দুটোর মধ্যে কত গভীর যোগ!'

'আমরা সব বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারলুম না, এই যা দুঃখু—'

সন্তাকে কিছুক্ষণ আবার একটু অন্যমনস্ক মনে হলো। সে হয়তো এখান থেকে পালাবার কোন উপায় ভাবছে। হঠাৎ সে তড়াক্ করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে টেনে তুললো। বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম—'কি?'

'একটা কথা এতক্ষণ মাথায় আসেনি—'

'কি কথা?'

'সোনাগুলো তাহলে নিশ্চয়ই এখনো এই জমিদারবাড়িতেই আছে। আজ রাত্তিরেই ওগুলো কোথাও চালান হয়ে যাবে।'

'আমরা কি করতে পারি?'

'কিছুই পারিনা, ঠিক। যদি পালাতে পারতুম, তাহলে রাত্তিরের

আগে পুলিশ এনে ধরিয়ে দিতে পারতুম। এখনো সময় ছিল।'

'কিন্তু পালাবার তো কোন উপায় নেই, সন্তা—'

সন্তা আমার হাত ধরে টানলো।

'চল্, একটু দেখাই যাক না—'

আমরা ঘুলঘুলির পথ দিয়ে গলে-আসা রোদ্দুরে ঘরের দরজা জানালাগুলো দেখতে পাচ্ছিলুম। দেয়ালের এক জায়গায় ছোট্ট জানালার মতো একটা দরজা দেখে ওটা খুলে ফেললুম। একটা অন্ধকার চোরাকুঠি। সন্তা হামাগুড়ি দিয়ে ওতে হাত গলালো। শুধুই অন্ধকার। চিত হয়ে শুয়ে পা গলিয়ে দিল তারপর। ফিসফিস করে বললো—'বিল্লু, একটা বাক্সের মতো কি যেন পায়ে ঠেকছে রে।'

বললুম—'বাক্স নিয়ে কি হবে? বেরোবার রাস্তা পেলে তবু একটা কথা ছিল—'

সন্তা পা দুটো টেনে বের করে এনে চোরাকুঠিটার ভেতর মাথা সেঁধিয়ে দিল। তারপর চোরাকুঠির ভেতরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, আর দেখতে পেলুম না। আমার ভয় করছিল। সন্তার যদি কোন বিপদ ঘটে, তাহলে আমি আর বাঁচবো না। আমি হামাগুড়ি দিয়ে চোরাকুঠির ভেতরে তাকালুম। অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ সন্তা ডেকে উঠলো—'বিল্লু, বিল্লু, শীগ্‌গির ঢুকে আয়—।'

'কেন?'

'দেখ্‌বি আয়, শীগ্‌গির—'

আমিও চোরাকুঠির ভেতরে ঢুকে গেলুম। হাত বুলিয়ে দেখলুম, ভারী একটা সুটকেস। সন্তা বললো—'চল্, আস্তে আস্তে এটা ও-ঘরে নিয়ে যাই। যেন কোন শব্দ না হয়।'

ওটা পাশের ঘরে নিয়ে এসে রোদ্দুরে দেখলুম, সেই সুটকেস! সন্তা আনন্দে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

সন্তা বললো—'এখন সব জলের মতো পরিষ্কার হলো তো? তুই তো আমার কথা বিশ্বাসই করতে চাস নি।

আমি সন্তাকে বোঝাতে চাইলুম, আমি এখানে নতুন এসেছি।

'...রোদ্দুরে দেখলুম, সেই সুটকেস!'

এখানকার সব মানুষকে আমি ঠিকমতো চিনি না। সেইজন্যে সব সময় ওর সব কথা আমি ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তবে ও যা বলেছে, আমি করেছি।

সন্তা আমার কোন কথাই শুনলো না। আনন্দে আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে বার দুই নেচে নিল। আমি বললুম—'সন্তা, ভুলে যাস নে, আমরা এখনো লোকটার জালের মধ্যে আটকে আছি। সুটকেসটাও এখনো ওরই হাতে।'

সন্তা ঝুপ্ করে সুটকেসটার পাশে শুয়ে পড়লো। আমি ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসলুম। আমার এখন মনে হচ্ছে, কোন রকমে যদি সুটকেসটা নিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারি, তাহলে সাহেবকুঠির ইতিহাসে আমাদের নাম চিরদিনের জন্যে লেখা হয়ে থাকবে। সুটকেস নিয়ে আমরা জিপে চড়ে সোজা থানায় চলে যাবো। থানার পুলিশেরা আমাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলবে—'সাবাস।' বাবাকে ছেড়ে দিয়ে ওঁর কাছে ওদের ক্ষমা চাইতে হবে। তারপর আমরা সবাই মিলে গাঁয়ে ফিরে আসবো। সবাই আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকাবে।

সন্তা বললো—'কোনদিকে পালাবার পথ আছে কিনা একবার খুঁজেই দেখা যাক্। কি বল্?'

বললুম—'চল্। দেখা যাক্ চেষ্টা করে।'

আমি মনে মনে জানতুম, এখান থেকে পালাবার আশা বড় একটা নেই। কি করেই বা থাকবে? যা অন্ধকার গোলকধাঁধা!

দুজনে উঠে দাঁড়াতেই মেঝের ওপর আলোর লুচিটায় চোখ পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভেতর চেপে-রাখা ক্ষিদেটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো। সন্তা এগিয়ে গিয়ে ওদিকের একটা বন্ধ দরজা খুলে ফেললো। আমাকে ডাকলো—'আয়—'

আমি সুটকেসের পাশে দাঁড়িয়েছিলুম। কাছে গিয়ে ওর হাত ধরলুম। সন্তা ওদিকের অন্ধকার ঘরটার ভেতর পা বাড়ালো। বললুম—'সন্তা, রাস্তা খুঁজতে গিয়ে এ ঘরটা যদি হারিয়ে ফেলি,

তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সুটকেসটা হাতে পেয়েও হারাতে হবে।'

সন্তা বললো—'ঠিক বলেছিস। চল্, সুটকেসটা হাতে নিয়েই যাই।'

সুটকেসের হ্যাণ্ডেলটা দুজনে হাতে ধরে নিয়ে চললুম। দরজাটা খুলেই রেখে গেলুম। সে ঘরের পর আরো একটা ঘর। অন্ধকার। সেই চামচিকের নাদি। পচা ভ্যাপসা গন্ধ।

আমি বললুম—'সন্তা, বেশিদূর যাওয়া ঠিক হবে না। শেষে ফিরতেই পারবো না। দেখ্ছিস তো, কি রকম অন্ধকার—'

সন্তা বললো—'ও ঘরে ফিরেই বা কি লাভ? সনাতনদা তো আর দরজা খুলে বলবে না যে, সুটকেসটা নিয়ে সোজা বাড়ি যাও—'

'ও চলে যাবার আগে আমাদের ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে তো!'

'সুটকেসটা কেড়ে নিয়ে তারপর—'

'তাহলে এক কাজ করি আয়, সন্তা। সুটকেসটা কোথাও লুকিয়ে রেখে দিই।'

'ঠিক বলেছিস, বিল্লু। ও তো জানে, চোরাকুঠিতেই সুটকেসটা আছে। সে ওখানেই খুঁজবে। ততক্ষণে আমাদের যদি ছেড়ে দেয়, আমরা বাইরে গিয়ে—'

জিজ্ঞেস করলুম—'বাইরে গিয়ে?'

সন্তা তার নিজের কথায় কোন জোর খুঁজে পেল না। খুব হতাশভাবে বললো—'দেখা যাক্, কি করা যায়।'

আমরা সুটকেসটা নিয়ে ওদিকের খুব অন্ধকার একটা ঘরের ভেতর রেখে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে আনলুম। সন্তা বললো—'মনে রাখিস্, কোথায় রাখলুম। শেষে যেন খুঁজে পাই আমরা—'

পরপর তিনখানা ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা আগের ঘরটায় ফিরে এলুম। রোদ্দুরের চাকতিটুকু ততক্ষণে মেঝে পেরিয়ে দেয়ালের গায়ে তেরচা হয়ে হেলে পড়েছে। রোদ্দুরটার রংও আর আগের মতো নেই, একটু লালচে হয়ে এসেছে। তার মানে বিকেলও এখন

যাই-যাই করছে।

কিন্তু এখন আর রাজার ডাক শুনতে পাচ্ছিনা কেন? রাজা কি তবে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে?

ক্ষিদেয় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে। শুধু ভাবছি, কখন সন্ধ্যে হবে, কখন লোকটা আমাদের ছেড়ে দিয়ে বলবে—'বাড়ি যাও—'

দুজনে মেঝের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। এখন ঘাড় আর গলায় বেশ ব্যথা। থুথু ঘিট্‌তেও কষ্ট হচ্ছে। লোকটা তখন যেভাবে গলা টিপে ধরে আমাকে শূন্যে তুলে ধরেছিল, আর একটু হলে আমার দম বন্ধ হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, লোকটা একখুনি সন্ধ্যে হলে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাবে। ওকে জব্দ করা গেল না। আমি যদি অরণ্যদেব হতুম, তাহলে আজ ওকে এমন শিক্ষা দিতুম, যা ও জীবনে ভুলতে পারতো না।

যারা বিপদে পড়ে, অরণ্যদেব অদ্ভুত উপায়ে তাদের উদ্ধার করেন। উনি আমাদের বিপদের কথা যদি জানতে পারতেন, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চিত এসে হাজির হতেন। লোকটাকে এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলে দিয়ে দরজা খুলে আমাদের মুক্ত করে দিতেন। সন্তা চিনতে পারতো কিনা জানি না, আমি সেই মুখোশধারী মানুষটিকে এক নজরেই চিনে নিতুম। সন্তাকে ওর সনাতনদার গালে মানুষের খুলির চিহ্ন দেখিয়ে বলতুম—'এই চিহ্নটা চিনে রাখ্, সন্তা। এটা অরণ্য-দেবের আঙ্‌টির ছাপ।'

হঠাৎ দরজায় শেকল খোলার শব্দ হতেই আমরা তড়াক করে লাফ মেরে উঠে বসলুম। বাইরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটাও টকটক করে নড়ে উঠলো। আমার মনে হলো অরণ্যদেব এসে গেছেন। এবার আমরা তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো। সন্তাকে বললুম—'খিল খুলে দে, সন্তা। উনি এসে গেছেন।'

সন্তা দোনামনা করছিল, খুলবে কি খুলবে না। আবার দরজায় শব্দ হলো, বার বার হতে লাগলো। বললুম—'তুই যদি খুলে না

দিস্, এই কাঠের দরজা এক্‌খুনি ভেঙে উনি ভেতরে ঢুকে আসবেন। তুই জানিস্ না, ওঁর গায়ে কত জোর।'

সন্তা কি ভাবলো, জানিনা। এগিয়ে গিয়ে খিলটা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ঝড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। নাহ্, অরণ্যদেব নয়, সন্তার সেই সনাতনদা। লোকটার কোমরে এখন একটা ভোজালি, মাথায় একটা লাল ফেট্টি বাঁধা। লোকটাকে এখন ঠিক খুনীর মতো লাগছে।

বাইরে এখনো আলো আছে। সূর্য ডুবছে কিংবা ডুবে গেছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু এতক্ষণ অন্ধকারে থাকার পর এই সামান্য আলোতেই আমার দুচোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আমি ভালো করে তাকাতেই পারছি না।

লোকটা আমাদের দুজনের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলো। সন্তা বললো—'ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি, সনাতনদা। এবার আমাদের ছেড়ে দাও।'

লোকটা আমাদের হাত ছেড়ে দিয়ে সামনে আড়াল তৈরি করে দাঁড়ালো। বললো—'ছেড়ে দেবোই তো! তবে তোরা যে জন্যে এসেছিস, তা কিন্তু হতে দেবো না।'

আমরা চমকে ওর মুখের দিকে তাকালুম। দাড়ির আড়ালে লোকটা কেমন একটা বাঁকা হাসি হাসছে।

'আমরা তো জমিদার বাড়ির ভেতরটা দেখতে এসেছিলুম—'

'মিথ্যে কথা!'

লোকটার চেহারা এক নিমেষে পাল্টে গেল।

'তোরা মন্দিরের সোনার খোঁজে এসেছিস। শোন্, মন্দিরের সোনা আমিই চুরি করেছি। আমি না করলেও কেউ না কেউ করতো। কিন্তু তোরা একথা কাউকে বলতে পারবি না।'

লোকটা যে সোনা চুরি করেছে, তা আমরা আগেই জেনে ফেলেছিলুম। আমরা তাই ওর কথায় এতটুকুও অবাক হলুম না। কিন্তু লোকটা আমাদের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করছে কেন,

বুঝতে পারলুম না। আমরা যে সোনার সুটকেস পেয়ে গেছি, লোকটা কি তা কোনভাবে জানতে পেরে গেছে? কিন্তু তাই-বা সে জানবে কি করে?

সন্তা বললো—'সোনা যে-ই চুরি করুক, আমাদের তাতে একটুও আগ্রহ নেই। আর, সনাতনদা, তুমি যদি চুরি করে থাকো, আমরাই বা বলতে যাবো কেন? আমাদের তাতে কি লাভ? আমরা তো জমিদারবাড়ির ভেতরটা শুধু দেখতে এসেছিলুম—'

'আবার সেই মিথ্যে কথা!'

লোকটা আবার ধমক দিয়ে উঠলো।

'তোরা যাতে কাউকে কিছু বলতে না পারিস, আমাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সত্যি বলছি, আমরা কাউকে কিছু বলবো না।'

লোকটা দাড়ির আড়ালে আবার আগের মতো বাঁকা হাসি হাসলো। তারপর হঠাৎ খপ্ করে কোমরের ভোজালিটা খাপের ভেতর থেকে টেনে বের করে সন্তার গলা আর পেটের ওপর আলতো করে বুলিয়ে নিয়ে খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলো।

'তাহলে তোদের কোন ভাবনা থাকে না, আমারও কোন ভাবনা থাকে না।'

আমরা এতটা ভাবিনি। আমাদের কেমন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, লোকটা শেষ পর্যন্ত আমাদের ছেড়ে দেবে। আমরা রাজাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবো। তারপর যা বলার, সবাইকে বলবো। তখন যা হবার, হবে।

কিন্তু এখন লোকটার কথা শুনে আমার কান্না পাচ্ছে। আমাকে কেটে ফেললে বাবা, মা আর বুলির কি হবে? আর, আমার কলকাতার বন্ধুরা, আমার স্কুলের সহপাঠীরা—তারা শোকসভা করে আমার জন্যে কত কাঁদবে।

লোকটা আমাদের হাত ধরে টানতে টানতে আবার সেই ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। দরজায় খিল তুলে দিয়ে সেই চোরাকুঠিটার

দিকে গেল। বললো—'তোরা এখানে দাঁড়া। একটুও নড়বি না। আমি আসছি—'

সে হামাগুড়ি দিয়ে চোরাকুঠির ভেতরে গেল। ওখানে সে পাগলের মতো কী খুঁজতে লাগলো। সম্ভবত সেই সুটকেসটা। খুঁজে না পেয়ে সে চিৎকার করে উঠলো—'তোরা জানিস, আমার সুটকেসটা কোথায়—'

আমরা এক সেকেণ্ড আর দাঁড়িয়ে না থেকে ছুটতে শুরু করলুম। উত্তেজনার মাথায় মুখস্থ-করা পড়াও ভুলে যেতে হয়। সব কিছু গুলিয়ে যায়। আমরাও ওখানে বাইরে যাবার দরজাটা হারিয়ে ফেললুম। ভুল দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে শেষে আমরা দেয়াল ধরে দৌড়তে লাগলুম।

লোকটা হুড়মুড় করে চোরাকুঠির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। ইস্, কত বড় সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল। যদি আমরা কোন রকমে বাইরে যাবার দরজাটা খুঁজে পেতুম, তাহলে এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যেতে পারতুম। হয়তো লোকটাকে ধরিয়েও দিতে পারতুম নাহ্, তা আর হলো না। লোকটা বেরিয়ে এসে আমাদের ধরবার জন্যে অন্ধকারে তাড়া করতে লাগলো। আমরাও যেদিকে পারি, ছুটতে লাগলুম। ওভাবে ছুটতে গিয়ে আমি আর সন্তা এক সময় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলুম। তাতে একটা সুবিধে হলো। লোকটা একসঙ্গে আমাদের দুজনকে ধরতে পারবে না। কিন্তু অসুবিধে হলো আর একটা। অন্ধকারে আমার পায়ের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে সন্তা দূরে পালাতে লাগলো। আমিও সন্তার পায়ের শব্দ শুনে লোকটা আমাকে ধরতে আসছে ভেবে ভয় পেয়ে দূরে পালাতে লাগলুম।

এইভাবে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক সময় লোকটা খপ্ করে আমার একটা হাত ধরে ফেললো। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলুম। এমন সময় সন্তা বাইরের দরজার খিলটা হুট করে খুলে ফেললো। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেনে নিয়ে সেই আলোর দিকে ছুটে গেল।

বাইরে বেরিয়ে সন্তা পড়ি-মরি করে ছুটতে লাগলো। শিকার ফস্‌কে যাচ্ছে দেখে লোকটাও ওর পেছনে ছুটছে। আমি হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। আমিও লোকটার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছি। খানিকটা দূরে গিয়ে সন্তা ধরা পড়ে গেল। আমরা তিনজনে হাঁপাচ্ছি। রাজার বোধহয় ঘুম ভেঙে গেছে। সে কখন থেকে ঘাউ ঘাউ করে এক নাগাড়ে ডেকেই চলেছে।

লোকটা আমাদের আগের ঘরটার সামনে টানতে টানতে নিয়ে এলো। একটু দম নিয়ে লোকটা সন্তাকে আমার পেছনে ঠেলে দিয়ে খপ্‌ করে কোমরের খাপ থেকে ভোজালিটা টেনে বের করলো। আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম।

আমাকে এক ঝট্‌কায় মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে ফেলে আমার পেটের ওপরের জামা টেনে খুলে দিল। আমার তখন শুধু মার মুখ আর বুলির মুখ মনে পড়ছে। আমি সন্তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শুনতে পেলুম, সে তার কৌটোর ঢাকনাটা খুট করে খুলে ফেললো। তারপর সে আমার বুকের ওপর দিয়ে লোকটার একেবারে মুখের সামনে তার কৌটোটা এগিয়ে ধরলো। লোকটা ভয়ে আঁতকে একটু পিছু হটতেই আমি পাক খেয়ে এক পাশে উঠে দাঁড়ালুম, সন্তার কালনাগিনী লোকটার একেবারে মুখের সামনে ফণা উঁচিয়ে ছোবল দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো—'সাপটা ফেলে দে শীগ্‌গির। নইলে এক্‌খুনি তোদের দুটোকে—'

সন্তার কালনাগিনী যত এগিয়ে যাচ্ছে, লোকটা ততই পিছু হটছে। শেষে লোকটা মরিয়া হয়ে ভোজালিটা তুলে সন্তার গলায় বসাবার জন্যে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সে এক সাংঘাতিক মুহূর্ত! সন্তার কালনাগিনী ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে। আর, লোকটার হাতের ভোজালি সন্তার গলায় নেমে আসবার জন্যে সুযোগ খুঁজছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোকটার পেছন দিক থেকে কাদের জুতোর

শব্দ হলো। লোকটা ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালোও না। হয়তো তার ঘাড় ফেরাবার সুযোগ ছিল না, নয়তো সে ভেবেছিল, ওগুলো তার ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। আমি দেখলুম, বাবা তাঁর খোলা রিভলভার হাতে ছুটে আসছেন। তাঁর পেছনে অবন্তীবাবু।

'ঘাড় ঘুরিয়েছ যদি, গুলি করবো—'

এ যে বাবার গলা! আমার বুক দশহাত ফুলে উঠলো। আমি কাঁদবো, না আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচবো, ভেবে পেলুম না।

লোকটার ভোজালিসুদ্ধু হাত ঝুলে পড়লো। বাবা ধমক দিয়ে বললেন—'হাতের ওটা ফেলে দাও।'

লোকটা ভোজালি ফেলে দিল। ইস্, আর একটু দেরি হলে আমরা এ দৃশ্য দেখতে পেতুম না।

অবন্তীবাবু ভালো করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—'তুমি ঠাকুর মশাইর ছেলে সনাতন, না?'

লোকটা শান্ত গলায় বললো—'দেখতেই তো পাচ্ছেন—'

এবার আমি কেঁদে ফেললুম। কেন কেঁদে ফেলেছিলুম, জানি না। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে আসতে পারলে বোধহয় মানুষ এইভাবে কাঁদে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের পেছন দিক থেকে আবার অনেকগুলো জুতোর শব্দ শোনা গেল। আমি আর সন্তা পেছন ফিরে তাকালুম। দেখলুম, অনেকগুলো পুলিশ আসছে। তারা ভারী-ভারী পা ফেলে ছুটে এসে লোকটাকে ধরে ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

পুলিশের অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন—'সুটকেসটা কোথায়?'

আমরা এতক্ষণ সুটকেসটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। পুলিশ অফিসারের কথা শুনে আমাদের ওটার কথা মনে পড়লো। সন্তা আর আমি খোলা দরজার দিকে ছুটে গেলুম। সন্তা বললো—'আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি—' সঙ্গে একজন পুলিশ নিয়ে অফিসারটি আমাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। হাতে টর্চ। টর্চের আলোতে আমরা

পর পর তিনখানা ঘর পেরিয়ে গেলাম। পরের ঘরটার এককোণে সুটকেসটা পড়েছিল।

পুলিশ অফিসার সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। বললেন—'এই সুটকেসটাই তো?'

বাবা এবং অবন্তীবাবু একসঙ্গে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটেই—'

পুলিশ অফিসারটির তার পরের প্রশ্ন—'এর চাবি কোথায়?'

সবাই সনাতন চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকালো।

অফিসারটি সনাতনের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—'চাবি কোথায়?'

সনাতন বললো—'জানি না।'

সন্তা আর স্থির থাকতে পারলো না। সে ছুটে গিয়ে পাশের একটা ঘরের শেকল টেনে হাট করে দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা লাফ মেরে বেরিয়ে এসে সন্তাকে, আমাকে, বাবাকে আর অবন্তীবাবুকে একটু করে চেটে নিয়ে সনাতনের কোমরে দু'পা তুলে দাঁড়ালো।

বাবা আদরের সুরে ধমক দিলেন—'রাজা, ওকে কামড়াস্‌নে—'

রাজা সনাতনের একটা হাত মুখে পুরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলুম, পুলিশের গাড়ি আর আমাদের জিপটা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। দুটোকে ঘিরে অসংখ্য মানুষের জটলা—সবার চোখে-মুখে ভয়, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা।

মা আর বুলি তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো।

বুলির কাছে শুনলুম, বাবা আর অবন্তীবাবু থানা থেকে ফিরে এসে আমাকে, সন্তাকে আর রাজাকে দেখতে না পেয়ে জিপে করে থানায় গিয়ে সব কথা জানান। ইতিমধ্যে গাঁয়ে রটে গিয়েছিল, আমরা জমিদারবাড়িতে ঢুকেছি, কে নাকি দেখেছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল, জমিদারবাড়ির ভেতরে কেউ হয়তো আমাদের মেরে

ফেলেছে, নয়তো আট্‌কে রেখেছে।

বাবা আর অবন্তীবাবু পুলিশ নিয়ে ফিরে এলে সবাই জমিদার-বাড়িতে ওঁদের খুঁজে দেখতে বললো। তাদের কথামতোই পুলিশ জমিদারবাড়িতে আমাদের খুঁজতে ঢুকেছিল।

সবাই সনাতনকে ভিড় করে দেখতে লাগলো। হাতকড়া-পরা সনাতনকে দুপাশে দুজন পুলিশ ধরে আছে। ভৈরব চক্রবর্তীর ছেলে সনাতনকে সবাই চেনে। সব শেষে একজন পুলিশ সনাতনের ঘোড়াটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। সবাই ঘোড়াটাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

তারপর সবাই আমাদের ঘিরে ধরলো। আমি আর সন্তা মা, বাবা, অবন্তীবাবু আর বুলির সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলুম। আমার হাতে ছিল রাজার গলার কলার। সন্তার ঝোলায় তার ভয়ঙ্কর কালনাগিনী। সাহেবকুঠির গুণ্ডা ছেলে দুটো আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কালো ছেলেটা বললো—'তোমাদের সাহস বটে, ভাই—'

ফর্সা ছেলেটা বললো—'ওরা না হলে তো চোরটা ধরাই পড়তো না।'

সন্তা বললো—'মাঝে মাঝে সাহেবকুঠির রাস্তায় ঘোড়া ছুটিয়ে যে চলে যেত, সে আর কেউ নয়—আমাদের এই সনাতনদা। সনাতনদা লুকিয়ে ভৈরব জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করতে আসতো।'

'তাই নাকি?'

'ভৈরব জ্যাঠার সঙ্গে সনাতনের ঝগড়াটা আসলে কিছুই নয়—সোনা চুরির জন্যে একটা বানানো ব্যাপার। বুঝলে সবাই?'

ভৈরব চক্রবর্তী পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। সবাই ভৈরব চক্রবর্তীর মুখের দিকে তাকালো। পুলিশ অফিসার ভৈরব চক্রবর্তীকে বললেন—'চক্রবর্তীমশাই, সুটকেসের চাবিটা কোথায়, আপনি জানেন কি?'

ভৈরব চক্রবর্তী চমকে গেলেন একটু। বললেন—'হ্যাঁ, চাবিটা তো আমার কাছেই আছে।'

পুলিশ অফিসারের হাতে চাবি দিয়ে ভৈরব চক্রবর্তী পায়ের

খড়ম খুলে তাঁর ছেলের দিকে তেড়ে গেলেন—'কুলাঙ্গার, আমার মুখে চুনকালি দিয়ে গেলি—'

সবাই তাকে আটকালে আমি বললুম—'শনিবারের মাঝরাত্তিরে যে ভূতুড়ে শব্দ হতো, সে তো ওই ভৈরব চক্রবর্তীই করতেন। মাঝরাত্তিরে বসে বসে উনি মন্দিরের দেয়াল ফুটো করতেন আর গাঁয়ে রটিয়ে দিতেন শ্মশান থেকে শব্দটা আসে।'

অফিসারটি বললেন—'তাহলে তো, চক্রবর্তীমশাই, আপনাকেও থানায় যেতে হচ্ছে।'

ভৈরব চক্রবর্তী পায়ে খড়ম পরতে পরতে বললেন—'আমি বুড়ো মানুষ। আমাকে আবার থানায় টানাটানি কেন?'

অফিসারটি নাছোড়বান্দা। বললেন—'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। উঠুন—'

আমরা থানা থেকে ফিরছি। সাহেবকুঠির কালো গুণ্ডা ছেলেটা সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের জগদ্দল-মার্কা জিপটা থামালো। জিপ দাঁড়াতেই সে হাসতে-হাসতে আমার সামনে এসে আমার সেই হারানো চটিটা আমাকে ফেরত দিয়ে বললো—'এটা তোমার—তাই না? সেদিন রাত্তিরে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।'

খুশী হয়ে আমার চটিটা আমি ফেরত নিলুম। এক-সুটকেস সোনা পেলেও আমি এত খুশী হতুম না।

৫১